উম্মাতুন ওয়াহিদাহ

আমরা এক উম্মাহ

ইস্যু – ০৩ || ২০২০ ইংরেজি || ১৪৪১ হিজরী

৯/১১ উপলক্ষে প্রকাশিত বিশেষ সংখ্যা

AL HIKMAH MEDIA

সূচীপত্র ২

৩| প্রস্তাবনা

৯| নায়কেরা...
ইমামুল মুজাহিদ শাইখ উসামা বিন লাদেন (রহিমাহুল্লাহ)

১৬| যেভাবে সে এলো
৯/১১ হামলা: পরিকল্পনা ও ক্রমবিকাশ

২৬| আমেরিকার জনগণ কি ৯/১১ হামলার কারণসমূহ অনুধাবন করতে পেরেছে?

৩১| সেপ্টেম্বর ১০ - ইতিহাসের সন্ধিক্ষণে

৩৯| আমেরিকার জনগণের প্রতি বার্তা
শাইখ উসামা বিন লাদেন (রহিমাহুল্লাহ)

৪৩| ৯/১১ হামলার বীর মুজাহিদ
শাহাদত পিয়াসী আবুল আব্বাস আল জানুবি

৪৬| ৯/১১ হামলার বীর মুজাহিদ
শাহাদত পিয়াসী ইবনুল জাররাহ আল গামিদি

৫০| ৯/১১-এর কিছু সুদূরপ্রসারী ফলাফল

৫৭| আপনি জানেন কি?
৯/১১ আক্রমণ সম্পর্কে কিছু তথ্য ও পরিসংখ্যান...

তোমরা জুলুম বন্ধ না করলে
আমরাও প্রতিশোধ নেওয়া বন্ধ করব না

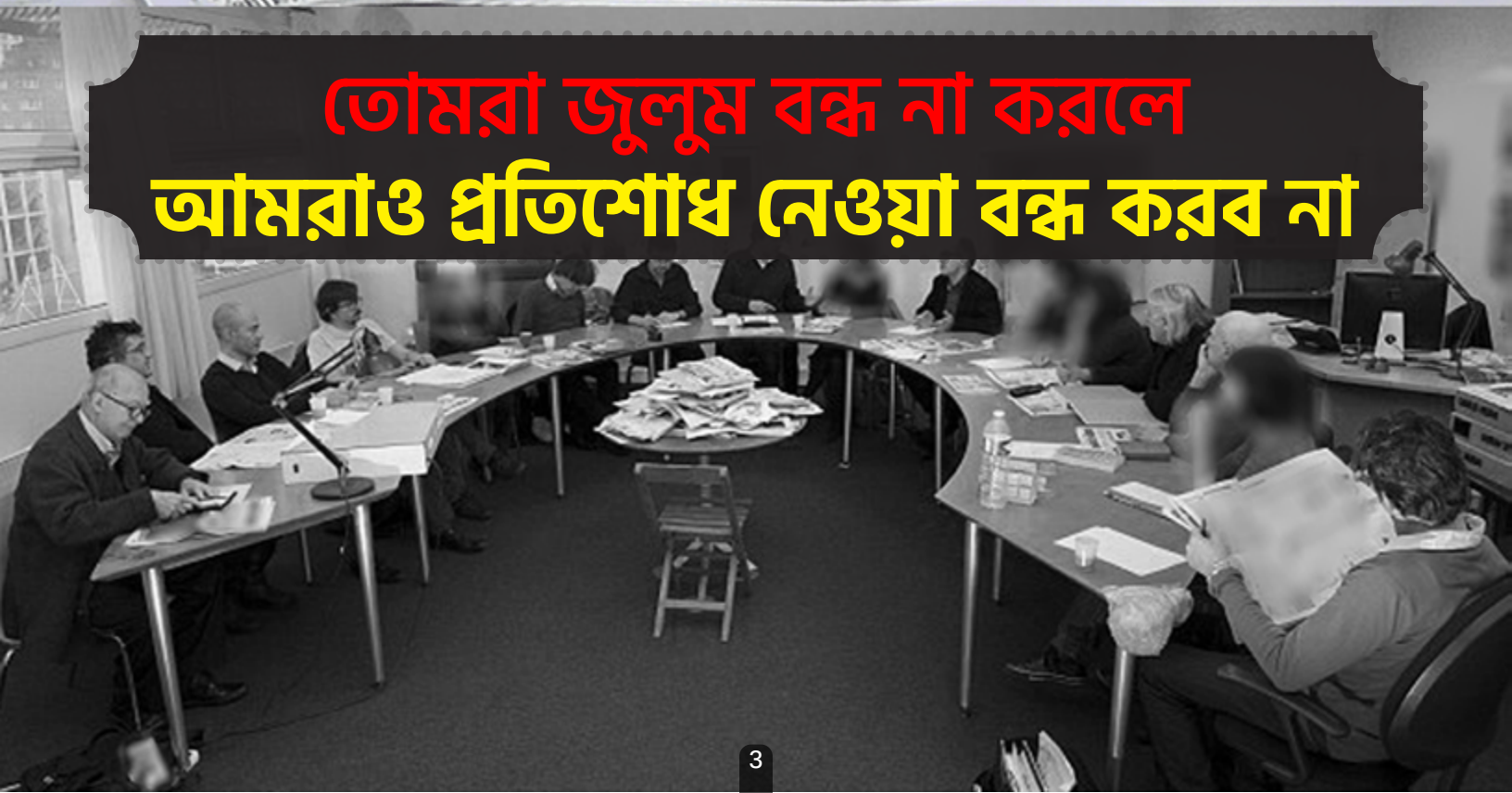

যারা ইসলাম ও মুহাম্মাদ ﷺ-কে কটূক্তি করতে চায় তাদের জন্য সুস্পষ্ট এক বার্তা ছিল শার্লি হেবদো অপারেশন।[1] ইসলাম এবং মুহাম্মাদ ﷺ-কে অবমাননাকারীদের প্রাপ্য বুঝিয়ে দিতে এই মুসলিম উম্মাহয় বীরের অভাব নেই। ঈমান ও আত্মসম্মানের দাবি হল, যারা মুহাম্মাদ ﷺ-কে অপদস্থ করবে, তাদের হত্যার বিষয়ে সামান্যতমও আপোষ চলবে না।

ইউরোপ এবং বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মুসলিমদের স্পষ্ট চ্যালেঞ্জ জানিয়ে, শার্লি হেবদো ম্যাগাজিন, অপারেশনের কয়েকদিনের মাথায় মুহাম্মাদ ﷺ এর ব্যঙ্গচিত্রগুলো পুনরায় প্রকাশ করে। এই ঘটনা ইসলাম ও মুসলিমদের প্রতি নব্যক্রুসেডারদের বিদ্বেষ সুস্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তোলে। বিশেষ করে ফ্রান্সের ইসলাম বিদ্বেষ সুস্পষ্ট হয় এর মাধ্যমে। অবশ্য ইতিহাসের পাতা ঘাটলে দেখা যায়, ইসলাম বিদ্বেষের ক্ষেত্রে ফ্রান্স সবসময় প্রথম সারিতেই অবস্থান করেছে। ক্রুসেডের পতাকাবাহী ছিল এই ফ্রান্স। নব্যক্রুসেডেও ফ্রান্সের ইসলাম বিদ্বেষ কুৎসিতভাবে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে।

শার্লি হেবদো ম্যাগাজিনের নতুন সম্পাদকীয় পরিষদ যদি বিশ্বাস করে, যে শার্লি হেবদোর সদর দফতরের বীরত্বপূর্ণ আক্রমণটি ছিল বিচ্ছিন্ন ঘটনা, তবে তা হবে এক মারাত্মক ভুল। এই মূর্খতার জন্য চরম মূল্য পরিশোধ করতে হবে তাদের। সমগ্র মুসলিম উম্মাহ তাদের কাছে এই বার্তাটি সুস্পষ্টভাবে পৌঁছে দিতে চায়- তোমরা যদি রাসূল ﷺ এর অবমাননা বন্ধ না করো, তাহলে আমরাও তোমাদের রক্ত ঝরানো বন্ধ করব না।

যে উম্মাহ বীর কৌওয়াশি ভাইদের জন্ম দিয়েছে, তাদের মধ্যে সেই পুরুষের অভাব নেই, যারা এই দুই ভাইয়ের অনুসৃত পথে পথ চলবে। মুহাম্মাদ ﷺ এর অবমাননাকারীকে কতল করার জন্য এই উম্মাহয় মানুষের অভাব নেই। এই উম্মাহর সকল বিশ্বাসী এই স্লোগান বুকে নিয়ে বাঁচে -যদি আমরা মুহাম্মাদ ﷺ এর অবমাননার প্রতিশোধ না নেই, তবে যেন আমাদের মায়েরা প্রিয়জন হারা হয়।

তোমরা যদি রাসূল ﷺ এর অবমাননা বন্ধ না করো, তাহলে আমরাও তোমাদের রক্ত ঝরানো বন্ধ করব না।

ম্যাক্রোর[2] ফ্রান্স, শার্লি হেবদোকে রাসূল অবমাননার ক্ষেত্রে পৃষ্ঠপোষকতা করেছে।

ওঁলাদের[3] ফ্রান্সকে আমরা যে বার্তা দিয়েছিলাম ম্যাক্রোর ফ্রান্সের জন্যেও আমাদের সেই একই বার্তা - **যদি তোমাদের বাকস্বাধীনতার কোনও সীমা না থাকে, তবে আমাদের প্রতিশোধ নেবার স্বাধীনতার মুখোমুখি হবার জন্য নিজেদের প্রস্তুত করো।**

---

1 প্যারিসের শার্লি হেবদো ম্যাগাজিন, মুহাম্মাদ ﷺ এর ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশ করেছিল। এর জবাবে ২০১৫ সালের জানুয়ারিতে শার্লি হেবদোর অফিসে হামলা চালানো হয়। এতে পত্রিকাটির সম্পাদকসহ মোট ১২ জন রাসূল অবমাননাকারী নিহত হয়।

2 ফ্রান্সের বর্তমান প্রেসিডেন্ট। চরম ইসলাম বিদ্বেষী এবং মুহাম্মাদ ﷺ এর অবমাননাকারী হিসেবে সুপরিচিত। ২০২০ সালের অক্টোবরে পুনরায় ফ্রান্স জুড়ে মুহাম্মাদ ﷺ এর অবমাননা শুরু হয়। ম্যাক্রো তাতে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছিল।

3 ফ্রাসোয়া ওঁলাদে, ফ্রান্সের সাবেক ইসলাম বিদ্বেষী প্রেসিডেন্ট। ২০১২-২০১৭ মেয়াদে সে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ছিল। তার আমলেই মুজাহিদরা শারলি হেবদোতে বীরোচিত হামলা চালান।

আমাদের প্রতিশোধ নেবার স্বাধীনতাকে গ্রহণ
করার জন্য তোমাদের অন্তরগুলো প্রস্তুত করো

তোমরা আমাদের নারী এবং শিশুদের হত্যা করছ। এটা আমাদের জন্য খুব দুঃখজনক বিষয়। কিন্তু এমন দুঃখজনক ঘটনাও হার মেনে যায় যখন তোমরা কুফুরীতে বিভোর হয়ে লড়াইয়ের সকল শিষ্টাচার থেকে নিজেদের মুক্ত করে নাও। এবং এধরণের ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশের মতো সীমালঙ্ঘন করো। এটা আরো বেশি কষ্টের। এজন্য তোমাদের অধিক মূল্য পরিশোধ করতে হবে।

একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমি তোমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করছি- তোমরা এই অবমাননাকর চিত্রগুলো প্রচার করেছ, কিন্তু তা সত্ত্বেও, প্রায় দেড়শ কোটি মুসলিম মারিয়াম আ. এর পুত্র আল্লাহর রাসূল ঈসা (যীশু) আ. এর প্রতি কোনও অবমাননাকর প্রতিক্রিয়া দেখায়নি। এর কারণ হল আমরা সমস্ত নবীদের উপর ঈমান রাখি। এবং এটাও বিশ্বাস করি যে, যদি কোনও ব্যক্তি একজন নবীকে নিয়েও ব্যঙ্গ করে কিংবা অপমান করে তবে সে মুরতাদ ও কাফির হয়ে যায়।

এটি উল্লেখ করা জরুরী যে, "বাকস্বাধীনতা" ও তোমাদের আইনের পবিত্রতা এবং অপরিবর্তনশীল বৈশিষ্ট্যের অজুহাত দেখানোর কোনও প্রয়োজন নেই। যদি তাই হয়, তবে কীসের ভিত্তিতে তোমাদের ভূমিতে অবস্থানরত আমেরিকান সৈন্যরা তোমাদের আইন পালন করা থেকে অব্যাহতিপ্রাপ্ত হয়? এবং কীসের ভিত্তিতে তোমরা ঐ সমস্ত লোকদের স্বাধীনতা হরণ করছ, যারা একটি ঐতিহাসিক ঘটনার পরিসংখ্যান নিয়ে সন্দেহ পোষণ করেছে? মানব রচিত যে আইনগুলো, মহান আল্লাহর আইনের সাথে সাংঘর্ষিক তা অন্তঃসারশূন্য, বাতিল। এগুলো পবিত্র নয়, এবং আমাদের কাছে এগুলোর কোনই দাম নেই।

সবশেষে বলতে চাই, যদি তোমাদের বাকস্বাধীনতার কোনো সীমা না থাকে, তাহলে আমাদের প্রতিশোধের স্বাধীনতাকে গ্রহণের জন্য তোমাদের অন্তরগুলোকে প্রস্তুত করো।

মহান রাসুল (ﷺ) এর সমর্থনে

আমাদের নবী ﷺ, আমাদের ভূমি, আমাদের পবিত্রতা এবং সম্পদের উপর আগ্রাসন চালাচ্ছে জায়োনিস্ট-ক্রুসেডারদের জোট। তারা আমাদের দ্বীনের বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ হয়েছে। তাদের আগ্রাসনের জবার দেবার জন্য ইসলামের ব্যাপারে আত্মমর্যাদাশীল এবং আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে ভালোবাসেন এমন প্রত্যেক স্বাধীনচেতা মহান ব্যক্তিদের আমরা উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি।

এই জোটকে অবশ্যই হাত ও মুখ দ্বারা, কথা এবং কাজের দ্বারা প্রতিহত করতে হবে। আমেরিকা ও ইসরায়েলকে অবশ্যই জানতে হবে যে, মুসলিম উম্মাহ জেগে আছে। এবং মুজাহিদদের কাফেলা তাদের জুলুমের সামনে নীরব থাকবে না।

হে আমার মুসলিম উম্মাহ, জায়োনিস্ট-ক্রুসেডার জোট, শক্তি প্রয়োগের ভাষা ছাড়া আর কিছুই বোঝে না। যদি আমরা শক্তি অর্জন না করি, তবে জায়োনিস্ট-ক্রুসেডারদের এই আগ্রাসন আমাদের ধর্ম, আমাদের নবী ﷺ, আমাদের ভূখণ্ড এবং আমাদের সম্পদের বিরুদ্ধে অবিরাম চলতে থাকবে।

আমাদেরকে অবশ্যই যুদ্ধ, রাজনীতি, আদর্শ, দাওয়া এবং সচেতনতা সৃষ্টিতে শক্তিশালী হতে হবে। আমাদের অবশ্যই আমেরিকা, ইসরায়েল এবং পশ্চিমা বিশ্বের যারা আমাদের জুলুম করে, তাদেরকে মোকাবেলা করতে হবে। যারা জায়োনিস্ট-ক্রুসেডারদের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে তাঁদেরকে সমর্থন যোগাতে হবে। অবশ্যই যেসব খ্রিস্টান আমাদের প্রতি ও আমাদের নবীর ﷺ প্রতি শত্রুভাবাপন্ন এবং যেসব খ্রিস্টান আমাদের সাথে শান্তি বজায় রাখতে আগ্রহী তাদের পৃথক করতে হবে।

[ডাঃ. আয়মান আল জাওয়াহিরি হাফিজাহুল্লাহ]

নায়কেরা...

- ইমামুল মুজাহিদ শাইখ উসামা বিন লাদেন (رحمه الله)

নিউইয়র্ক এবং ওয়াশিংটনে আক্রমণকারীরা ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছেন। গাদ্দার শাসক এবং তাদের অনুসারীদের নাপাকি থেকে এই উম্মাহকে পরিশুদ্ধ করেছেন। আমরা ৯/১১ এর এই আক্রমণগুলো নিয়ে কথা বলি, কিন্তু আক্রমণকারী ভাইদের ব্যাপারে তেমন আলোচনা করি না। এই মানুষগুলো শুধু টুইন টাওয়ার বা পেন্টাগনকে মাটির সাথে মিশিয়ে দেননি, বরং তাঁরা যুগের হুবালকে ধ্বংস করেছেন।

শতাব্দীর ফেরাউন আমেরিকা তার কুৎসিত রূপ নিয়ে হাজির হয়েছে। মিশরের ফেরাউন এবং বর্তমানের ফেরাউনের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। বরং বর্তমান ফেরাউন আমেরিকা আরো বেশি মিথ্যুক, আরো বেশি অবিশ্বাসী।

ফিলিস্তিন, আফগানিস্তান, ইরাক, লেবানন, কাশ্মীর এবং অন্যান্য মুসলিম ভূখণ্ডগুলোতে আমেরিকা আমাদের সন্তানদের হত্যা করছে। এই ১৯ জন মহানায়ক ঈমানদারদের অন্তরে ঈমানকে দৃঢ় করেছেন, মুসলিমদের আলওয়ালা ওয়ালবারাহ'র গুরুত্ব বুঝিয়েছেন। সেইসাথে ক্রুসেডার ও ক্রুসেডারদের পুতুল স্থানীয় শাসকগোষ্ঠীর পরিকল্পনা বানচাল করেছেন। আর এই হামলাটি হয়েছে এক নতুন দশকের শুরুতেই। এই দশক এমন এক মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধের, যার পরিকল্পনা করা হয়েছে ক্রুসেডারদের মতবাদকে নিস্তেজ করে দেবার জন্য।

যেভাবে এই মানুষদের স্মরণ করা উচিত, সময়ের অভাবে আমাদের পক্ষে তা করা সম্ভব নয়। আর তাঁদের গুণাবলী, যোগ্যতা, বরকতময় এই হামলার ব্যাপক প্রভাব ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করতেও এই কলম ব্যর্থ। তারপরেও আমরা চেষ্টা করতে পারি তাঁদের প্রাপ্য হক আদায়ের... যদিও তা পুরোপুরি আদায় করা সম্ভব নয়। কিন্তু যতোটুকু আদায় করা যায় তা আদায়ের চেষ্টা পরিত্যাগ করা উচিত নয়...

১। মুহাম্মাদ আত্তা

দলের কমান্ডার, মিশরের কেনান থেকে আগত। প্রথম টাওয়ারের ধ্বংসকারী। আন্তরিক, আনুগত্যশীল এবং সত্যবাদী। উম্মাহকে নিয়ে উদ্বিগ্ন। আল্লাহ তাঁকে শহীদ হিসেবে কবুল করুক।

২। জিয়াদ আল-জাররাহ

মুখলিস বান্দা। বৃহত্তর শামের অংশ লেবানন থেকে আগত। আবু উবায়দা আল-জাররাহ্ রাদিয়াল্লাহু আনহুর বংশধর। আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোক।

৩। মারওয়ান আশ-শিহি

আরব আমিরাত থেকে আগত, দ্বিতীয় টাওয়ারের ধ্বংসকারী। প্রচুর দুনিয়াবী ধন-সম্পদের অধিকারী। কিন্তু আল্লাহর পুরষ্কারের আশায় দুনিয়াকে উপেক্ষা করেছেন ।

৪। হানি হানজুর

তায়েফ থেকে আগত। পেন্টাগনে আক্রমণকারী। চারিত্রিক বিশুদ্ধতা এবং দ্বীনের জন্য আত্মত্যাগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আমরা তাঁর ব্যাপারে এমনটাই মনে করি এবং আল্লাহই অধিক জ্ঞাত।

৫। আহমদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল-না'য়ামি

মুহাম্মদ ﷺ এর বংশধর, আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত। কুরাইশী। নিরলস ইবাদতকারী, তাহাজ্জুদগুজার। অত্যন্ত ভদ্র। আহমদ স্বপ্নে দেখেন- মুহাম্মাদ ﷺ এর সঙ্গে ঘোড়ায় আরোহণ করেছেন তিনি। মুহাম্মাদ ﷺ তাঁকে বললেন- নেমে যাও এবং শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করে এই ভূমিকে মুক্ত করো।

৬। সাতাম আল-সুকামি

নজদ [1] থেকে আগত। দৃঢ়প্রত্যয়ী, কঠোর সংকল্পের অধিকারী, পুরুষালি ও সাহসী।

তাঁকে দেখলে মুহাম্মাদ ﷺ এর সেই হাদিসটির কথা মনে হবে- দাজ্জালের বিরুদ্ধে সবচেয়ে কঠোরতা প্রদর্শন করবে বনু তামীম ।

1 নজদ হচ্ছে সৌদি আরবের মধ্যবর্তী অঞ্চল।

৭। মাজিদ মুকাদ আল-হারবি

মদীনা থেকে আগত। বিশ্বস্ত ও বিনয়ী, সবসময় অন্যের প্রশংসা করতেন। অত্যন্ত নম্র এবং সুরুচিসম্পন্ন।

৮। রাবি'য়াহ নওয়াফ আল-হাজমি

মক্কার অধিবাসী। একজন লক্ষ্যসম্পন্ন, দৃঢ় প্রত্যয়ী, রক্ষণশীল এবং ভদ্র মানুষ... ঘোড়ার লাগাম ধরে রাখতেন (জিহাদের উদ্দেশ্যে) ও সবচেয়ে পছন্দনীয় স্থানে মৃত্যু খুঁজতেন।

৯। বিলাল, সা'লিম আল-হাজমি

মক্কার অধিবাসী। আল্লাহ তাঁর অন্তরে ঈমান অবতীর্ণ করেছেন, তাই তিনি এই আদর্শ বুকে নিয়ে সবকিছু ত্যাগ করেছেন - জান্নাত হল তরবারির ছায়ার নিচে।

১০। ফাইয়াজ আল-কাদি বানি হামিদ (আহমদ হিসেবে সুপরিচিত)

আত্মত্যাগ, মহত্ব, নম্রতা ও বিনয়।

১১। হামজা আল-ঘামিদি

তাঁর অন্তর জিহাদের প্রতি ভালবাসা দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল। ইবাদাতে বিনয়ী, আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী ও কোরআন তিলাওয়াতকারী। মিষ্টভাষী।

১২। ইকরিমাহ, আহমাদ আল-ঘামিদি

অসাধারণ সংকল্পের অধিকারী। ধৈর্যশীল ও উদার।

১৩। মু'তাজ সাঈদ আল-ঘামিদি

ইবাদতগুজার। তিনি সৎকাজের আদেশ দিতেন এবং অসৎ কাজে বাঁধা দিতেন। পৃথিবীতে দৈহিকভাবে উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু তাঁর অন্তর আল্লাহর আরশের নিচে জান্নাতের সবুজ পাখিদের সাথে ঘুরে বেড়াত। আমরা তাঁর ব্যাপারে এরূপ ধারণাই পোষণ করি এবং আল্লাহ সর্বাধিক জ্ঞাত।

১৪। উয়াইল আস- সিকিল্লি আশ- শিহরি এবং

১৫। ওয়ালিদ আস-সিকিল্লি আশ- শিহরি

এই দুই ভাই ছিলেন অনুগত, তাহাজ্জুদগুজার, উত্তম আখলাকের অধিকারী, বিনয়ী এবং উদ্যমী। তাঁদের পিতা একজন ব্যবসায়ী এবং গোত্রপ্রধান। দুনিয়ার চাকচিক্য তাঁদেরকে আহ্বান করছিল। কিন্তু তাঁরা দুনিয়ার ধনসম্পদ থেকে পালিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন আফগানিস্তানের রুক্ষ পাহাড়ে... আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায়।

১৬। উমার, মুহাম্মদ আশ-শিহরি

অনুপম চরিত্রের অধিকারী, ধৈর্য্যশীল। আন্তরিকভাবে শাহাদত চেয়েছিলেন। আমরা তাঁকে শহীদ হিসেবেই মনে করি এবং আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

১৭। খালিদ আল- মিহদার

মুহাম্মদ ﷺ এর বংশধর, আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত। কুরাইশী। শাহাদত প্রাপ্তির জন্য তিনি আন্তরিকভাবে দুয়া করতেন। আমরা তাঁকে শহীদ হিসেবেই মনে করি এবং আল্লাহই অধিক জ্ঞাত।

১৮। আহমাদ আল- হাযনাবি আল- ঘামিদি

বিপদে নির্ভীক ও অকুতোভয়, কোনো হুমকি তাঁর সংকল্পকে প্রভাবিত করতে পারত না। একজন ইমাম, দাঈ এবং জিহাদের প্রতি আহ্বানকারী।

১৯। শাইখ আবু আল-আব্বাস, আব্দুল আজিজ আল- উমারি আয-যাহরানি

সমসাময়িক আলেমদের জন্য দৃষ্টান্তস্বরূপ। পুণ্যবান সালাফদের পদাংক অনুসরণকারী। ঈলমকে, আমলে রুপান্তরকারী একজন আলেম। যালিম শাসকদের হাত থেকে এবং অর্থের দাস হওয়া থেকে ঈলমকে রক্ষা করতেন।

আবু আল-আব্বাস, আল-কোরআন, সহিহ বুখারী ও মুসলিম এবং আল্লাহর রাসূল ﷺ এর অন্যান্য হাদীসগ্রন্থসমূহ মুখস্থ করেন। কোরআন নাযিলের কারণ খুঁজতে গিয়ে তিনি উপলব্ধি করেন- কোরআনকে নাযিল করা হয়েছে এর উপর আমল করার জন্যেই। এই বিষয়টি তাঁর নিকট আরও স্পষ্ট হয় ইয়ামামাহর যুদ্ধ অধ্যয়নের পর। ইয়ামামাহর যুদ্ধে অনেক কোরআনের হাফেজ শহীদ হন। তাই কোরআন এবং হাদীসের উপর আমলকারীরা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ- এই কালেমা রক্ষার জন্য ছুটে আসেন। আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের জন্য তাঁরা প্রতিযোগিতা শুরু করেন।

পুণ্যবান সালাফ এবং তাঁদের অনুসারী দাবীদার, যারা অর্জিত ঈলমের উপর আমল করে না – তাঁদের মাঝে কতো পার্থক্য!

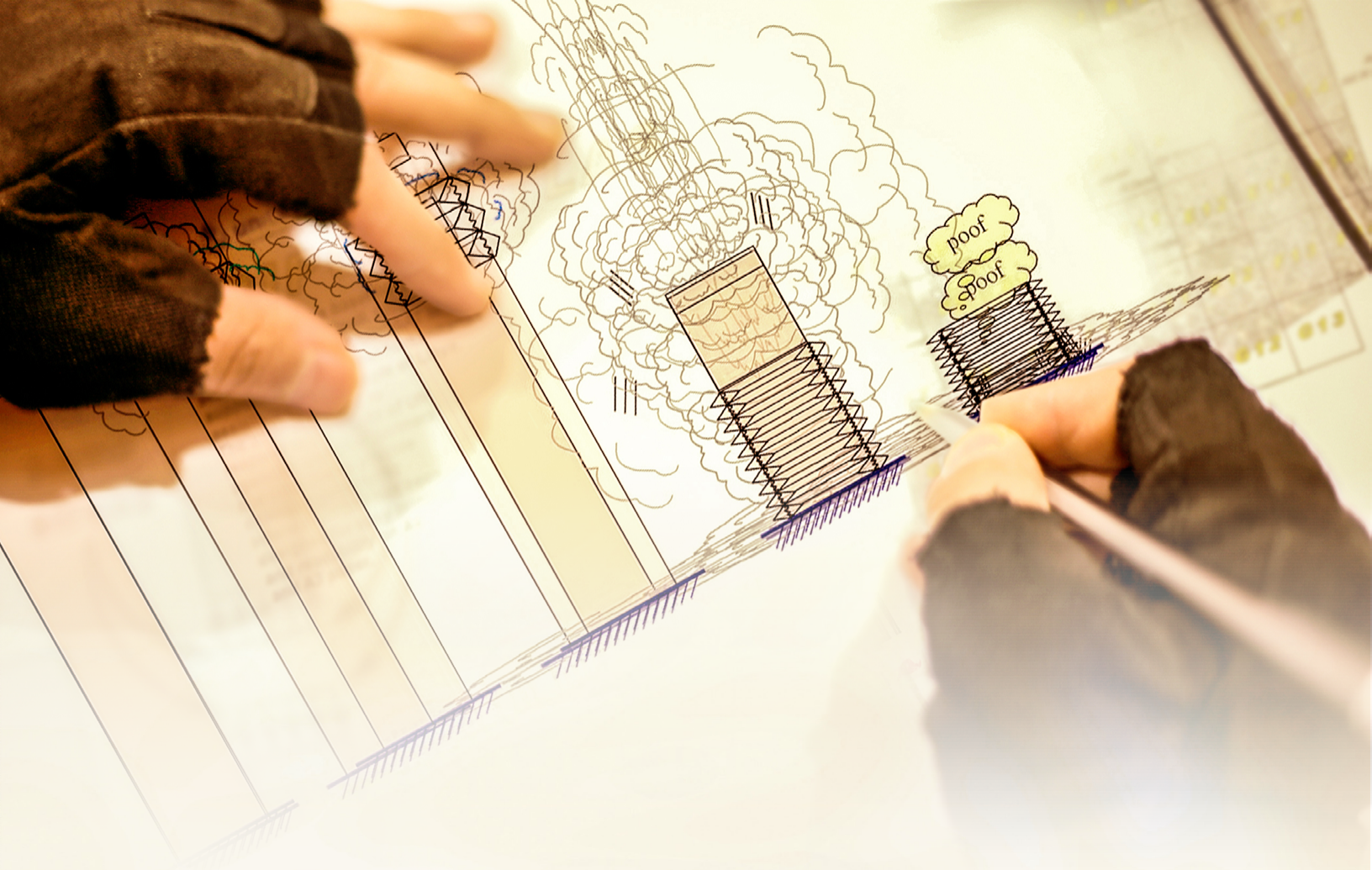

যেভাবে এটা এলো

৯/১১ হামলা: পরিকল্পনা ও ক্রমবিকাশ

খালিদ আল মিশরি

আশির দশকে পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিমের পেশোয়ার শহর ছিল বিভিন্ন দেশের অসংখ্য মুসলিম যুবকদের মিলনস্থল। তারা সেখানে আসত আফগান জিহাদে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে। যারা জিহাদের উদ্দেশ্যে আফগানিস্তানে প্রবেশ করতে চায় বা জিহাদের কৌশল, বিভিন্ন অস্ত্র চালানোসহ সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে ইচ্ছুক তাঁদের কেন্দ্রস্থল ছিল পেশোয়ার। নবাগতদের বেশিরভাগই ছিল যুবক। তবে তাঁদের বয়সের ব্যবধান ছিলো।

বিভিন্ন ঘরনার, বিভিন্ন দেশের বৈচিত্র্যময় দক্ষতার অধিকারী প্রায় সব বয়সের অসংখ্য লোক এসে একত্রিত হয় আফগানিস্তানে। ইসলামিক আন্দোলনকে বেশ দীর্ঘ সময় ধরে বুদ্ধিবৃত্তিক স্থবিরতা ঘিরে রেখেছিল। আফগানিস্তানে জিহাদ করতে আসা মুসলিমদের বৈচিত্র্যময়তা বুদ্ধিবৃত্তিক স্থবিরতার এই প্রাচীর ভাঙতে সাহায্য করে। জিহাদী এই পরিবেশ জিহাদ সংক্রান্ত ফিকহ এর উত্থানেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। জিহাদের ফিকহ আর কেবলমাত্র বইয়ের পাতায় সীমাবদ্ধ থাকে না। বরং ময়দানে ব্যবহৃত হতে থাকে।

হাদীসগ্রন্থ, পূর্ববর্তী সালাফদের কিতাব, অতীত এবং সমসাময়িক আলেমদের মতামত ইত্যাদি সংকলন করে অসংখ্য গ্রন্থ রচিত হতে থাকে। জিহাদের ফিকহ নিয়ে জোরকদমে গবেষণা শুরু হয়। দশকের পর দশকজুড়ে জিহাদ কেবল একাডেমিক আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল। আফগান জিহাদের এই সময়ে জিহাদ বইয়ের পৃষ্ঠা ছেড়ে, একাডেমিক আলোচনার গণ্ডি পেরিয়ে ময়দানে জীবন্ত হয়ে উঠে। সেইসাথে জিহাদের ময়দানে আবির্ভাব ঘটে বেশ কয়েকজন কিংবদন্তীর। যাদের মধ্যে খুব সম্ভবত সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তি হলেন আবদুল্লাহ আযযাম রহিমাহুল্লাহ। আমরা তাঁর ব্যাপারে এরূপ ধারণাই পোষণ করি। আর আল্লাহ তায়ালাই সকল জ্ঞানের অধিকারী।

জনপ্রিয় এক আন্দোলন হিসেবে ছড়িয়ে পড়ল আফগান জিহাদ। হাজার হাজার যুবক সাড়া দিল জিহাদের আহ্বানে। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আফগানি ভাইদের সুরক্ষা প্রদানের জন্য ছুটে এলো আফগানিস্তানে। সামনের সারিতে থেকে লড়াই করতে থাকল তারা। যুদ্ধে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখল। এমন বরকতময় পরিবেশেই জন্ম নিল ৯/১১ হামলার পরিকল্পনা।

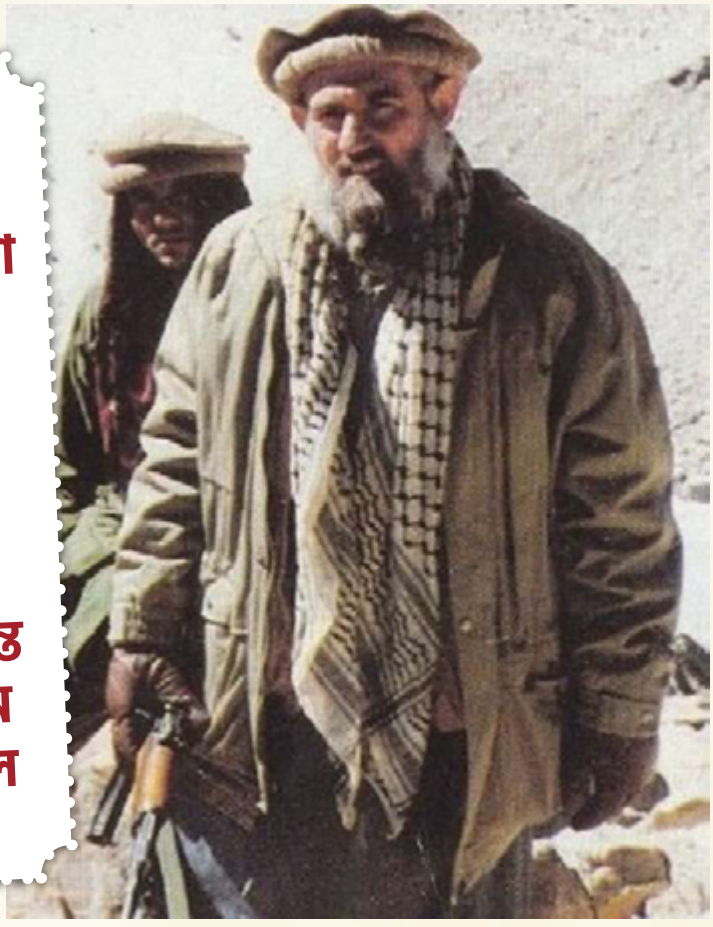

ইসলামিক আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরাই শুধু আফগানের ময়দানে হাজির হলেন বিষয়টি এমন নয়। জনপ্রিয় এক আন্দোলন হিসেবে ছড়িয়ে পড়ল আফগান জিহাদ। হাজার হাজার যুবক সাড়া দিল জিহাদের আহ্বানে। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আফগানি ভাইদের সুরক্ষা প্রদানের জন্য ছুটে এলো আফগানিস্তানে। সামনের সারিতে থেকে লড়াই করতে থাকল তারা। যুদ্ধে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখল। এমন বরকতময় পরিবেশেই জন্ম নিল ৯/১১ হামলার পরিকল্পনা।

শুরুতে এটি ছিল একটি কাগজে কলমে সীমাবদ্ধ একটি পরিকল্পনা মাত্র। বিভিন্ন যৌক্তিক কারণেই যা বাস্তবায়িত হতে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন পড়বে। ৯/১১ এর হামলার পরিকল্পনা দিন দিন বিভিন্ন ধাপ পেরিয়ে কীভাবে পূর্ণতা পেল তা আমি ভাইদের নিকট বর্ণনা করতাম। কিন্তু কখনো ভাবিনি যে একদিন এ বিষয়ে লিখতে বসব।

জিহাদের ময়দানে নবাগত কয়েকজন যুবক একদিন বসে বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ আলোচনা করছিল। তাদের সেই বৈঠকে খুব সাদামাটা ধারণা হিসেবে ৯/১১ এর হামলার বিষয়টি আসে। পরবর্তী বছরগুলোতে এই সাদামাটা ধারণাটিই ধীরে ধীরে বিকশিত হতে থাকে। অবশেষে ২০১১ এর সেপ্টেম্বরের ১১ তারিখে শত্রুপক্ষের জন্য অভূতপূর্ব আতঙ্ক এবং ভীতি নিয়ে তা বাস্তবে হাজির হয়। আমেরিকার ভিত্তিমূল কাপিয়ে তোলা এই দিনটাকে আমেরিকানরা স্মরণ করে এক কালো দিন হিসেবে।

এক মিশরীয় বিমানচালক...

পেশোয়ারে মুজাহিদ ভাইদের অতিথিশালায় একজন মিশরীয় পাইলট আসলেন। বিমানচালনায় তাঁর ব্যাপক অভিজ্ঞতা ছিল। বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক বিমান সংস্থার হয়ে বিমান চালিয়েছিলেন তিনি । পাইলট হবার সুবাদে তাঁকে বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ করতে হতো। ইউরোপ এবং আমেরিকার অধিকাংশ দেশেই তাঁর চেনাজানা ছিল। ভাইটি প্রায়ই তাঁর অতীত জীবনের কথা বর্ণনা করতেন। মূলত পারিপার্শ্বিক পরিবেশের প্রভাবেই অতীতে ইসলাম থেকে অনেক দূরে ছিলেন। তাঁর অতীতের কথা মনে করে প্রায় আফসোস করতেন - জীবনের অনেকগুলো বছর কাটিয়ে দিলাম কিন্তু আল্লাহর দ্বীন বা মুসলিম উম্মাহর কোনো খেদমত করতে পারলাম না!

নিজের ভুল বুঝতে পারা মাত্রই জিহাদের জন্য হিজরতের সিদ্ধান্ত নেন তিনি। এসময় তাঁর বেশ বয়স হয়েছিল। কিন্তু বৃদ্ধ বয়সও জিহাদের ময়দানে এসে যুদ্ধ করা, প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা থেকে তাঁকে রুখতে পারেনি। নিকষ কালো কনকনে শীতের রাতে পাহারা দেবার কাজ ছিল তাঁর সর্বাধিক কাঙ্ক্ষিত মুহূর্ত। আল্লাহর নিকট বিপুল পুরষ্কার প্রাপ্তির প্রতিশ্রুতি তাঁকে পাহারা

দেবার কাজে অনুপ্রাণিত করত।

কাফের মুশরিকরা মুসলিমদের ভূখণ্ডসমূহ দখল করে নিয়েছে। মুসলিমদের পবিত্র স্থানসমূহের পবিত্রতা নষ্ট করছে। এ বিষয়গুলো নিয়ে তিনি সঙ্গী মুজাহিদদের সাথে অনেক আলাপ আলোচনা করতেন। বিশেষভাবে ফিলিস্তিন নিয়ে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ছিলেন- যেখানে আমেরিকার সমর্থনে ইহুদিরা ব্যাপক অত্যাচার নির্যাতন চালাচ্ছে। মুসলিম ভূখণ্ড পুনরুদ্ধার এবং মুসলিমদের পবিত্র স্থানসমূহের পবিত্রতা রক্ষার উপায় খুঁজে বেড়াতেন তিনি।

বিদ্যমান বিশ্ব ব্যবস্থা মুসলিম উম্মাহকে দাবিয়ে রাখার, পরাধীন করে রাখার প্রধানতম হাতিয়ার। পাইলট ভাইটি বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থাকে দুর্বল করার উপায় নিয়ে আলোচনায় বেশ আগ্রহী ছিলেন। মুসলিম দেশসমূহের দালাল, গাদ্দার সরকারগুলোর প্রধান পৃষ্ঠপোষক এবং নিরাপত্তাদাতা আমেরিকাকে সম্ভাব্য কোন কোন উপায়ে দুর্বল করা যায় – তা নিয়ে বিভিন্ন মূল্যবান মতামত দিতেন।

পাইলট ভাই, আমেরিকার স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করার ব্যাপারে তাঁর প্রবল আগ্রহের কথা প্রকাশ করলেন। আমেরিকার স্বার্থে আঘাত হানার বিভিন্ন পরিকল্পনা উপস্থাপন করলেন। তাঁর একটি পরিকল্পনা ছিল এমন- বিমান ভর্তি গ্যালন গ্যালন দাহ্য জ্বালানি নিয়ে আমেরিকার কোনো বিখ্যাত টাওয়ারে মিসাইলের মতো আঘাত করতে হবে।

ভাইটির অনেক বয়স হয়ে গিয়েছিল। দৈহিক শক্তিও সীমিত হয়ে আসছিল। কিন্তু তারপরেও ইসলামি আন্দোলনকে সামনে এগিয়ে নেওয়া, কাফিরদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে কীভাবে ভূমিকা রাখা যায়, তা নিয়ে সবসময় চিন্তা করতেন।

একদিন এই পাইলট ভাই, শাইখ আবু উবাইদা আল-বানশিরির সঙ্গে এক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। শাইখ আবু উবাইদা আল-বানশিরির হলেন আল-কায়েদার সামরিক শাখার প্রধান এবং শাইখ উসামা বিন লাদেনের সহকারী। বৈঠকে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনার পর একসময় আলোচনার মোড় ঘুরল আন্তর্জাতিক কাফির শক্তির দিকে। পাইলট ভাই, আমেরিকার স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করার ব্যাপারে তাঁর প্রবল আগ্রহের কথা প্রকাশ করলেন। আমেরিকার স্বার্থে আঘাত হানার বিভিন্ন পরিকল্পনা উপস্থাপন করলেন। তাঁর একটি পরিকল্পনা ছিল এমন- বিমান ভর্তি গ্যালন গ্যালন দাহ্য জ্বালানি নিয়ে আমেরিকার কোনো বিখ্যাত টাওয়ারে মিসাইলের মতো আঘাত করতে হবে।

শাইখ আবু উবাইদা মনোযোগ সহকারে এই পরিকল্পনার কথা শুনেছিলেন । কিন্তু এটি একটি আইডিয়া হিসেবেই থেকে যায়। সে সময় অন্য অনেক কাজ অগ্রাধিকার তালিকার উপরের দিকে ছিল। তৎকালীন অগ্রাধিকারপূর্ণ কাজগুলো এই সাহসী পরিকল্পনাটিকে বাস্তবে রূপ নিতে দেয়নি। এ ধরণের বিশেষ অপারেশন পরিচালনার জন্য আল-কায়েদা তখনো প্রস্তুত ছিল না, ভবিষ্যতের বিষয় হিসেবেই রয়ে যায় এটি।

সে সময় আল-কায়েদা সবেমাত্র গঠিত হয়েছে। কিভাবে বেশি বেশি প্রশিক্ষণ ক্যাম্পের ব্যবস্থা করা যায়, কিভাবে আফগানিস্তানের মুজাহিদদের বিভিন্ন ফ্রন্টে সাহায্য করা যায়- এগুলোর

উপরেই আল- কায়েদার সকল মনোযোগ নিবদ্ধ ছিল। এর বাহিরে আল-কায়েদা সর্বোচ্চ যা করতে পারত তা হলো মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন ইসলামি আন্দোলনকে সীমিত আকারে সাহায্য করা। সুতরাং, এই পর্যায়ে এরকম বড় আকারের একটি অপারেশন আল-কায়েদার অগ্রাধিকার তালিকায় ছিল না।

মিশরীয় বিমানচালকের এই ঘটনাটি আমাকে বর্ণনা করেছেন শাইখ আবু হাফস ও শাইখ আবুল খায়ের (আল্লাহ তাঁদের কবুল করুক)। তাঁরা দুজনই ছিল শাইখ আবু উবাইদা আল-বানশিরির ঘনিষ্ঠ বন্ধু। দীর্ঘ সময় ধরে তাঁরা ক্যাম্পে ও বিভিন্ন ময়দানে শাইখ আবু উবাইদাকে সাহায্য করেছিলেন।

অতঃপর সুদান...

আফগানিস্তানে সোভিয়েত রাশিয়ার পতন হলে শাইখ উসামা বিন লাদেন সুদান গমন করেন। অবশেষে আমেরিকাকে টার্গেট করে একটি বিশেষ অপারেশনের পরিকল্পনার সুযোগ আসলো। আল- কায়েদার হাই কমান্ড বাস্তবসম্মত অপারেশনের পরিকল্পনা নিয়ে ভাবতে থাকলেন। সুন্দরভাবে কাজ অগ্রসর হতে থাকল ।

তাঁদের নিকটেই ছিল সোমালিয়ার জিহাদের ময়দান। কাজেই আমেরিকার স্বার্থে আঘাত হানার খসড়া পরিকল্পনা করা এবং সেগুলো পরীক্ষা করে দেখার সুযোগ পাওয়া যায়। কিন্তু এ ধরণের বড় মাপের অপারেশনের পরিকল্পনা করা বা পরিচালনা করা সুদানের পক্ষে সম্ভব ছিল না। সুদানের সংবিধানেও এর বৈধতা ছিল না। শাইখ উসামা বিন লাদেন তাঁর সঙ্গীদের পরামর্শে একটি নিজস্ব বিমান ক্রয় করার সিদ্ধান্ত নেন। সেসময় তিনি কিছু ভাইদের জন্য বিমান পরিচালনার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা জরুরী মনে করলেন, যেন তারা তাঁর বিমানটি চালাতে পারেন। ৯/১১ হামলার পরিকল্পনা বিকশিত হতে থাকল। মিশরের বৃদ্ধ পাইলট ভাই যে হামলার ছক কষে দিয়েছিলেন তা বাস্তবায়নের জন্যে এই পাইলট ভাইয়েরা কাজে লাগবেন। হোসাইন খোরাস্ত আল মাগরিবি[1] এবং এহাব আলীকে[2] প্রশিক্ষণ স্কুলে পাঠানোর জন্য নির্ধারণ করা হয়। হোসাইন, কেনিয়ার নাইরোবিতে ফ্লাইং স্কুলে ভর্তি হন, অন্যদিকে আলি ভর্তি হন আমেরিকার স্কুলে। আল-কায়েদার হাই কমান্ড তাদের নিয়ে কী পরিকল্পনা করেছেন তা এই দুইজন জানতে পারলেন না। তারা শুধু জানলেন শাইখ উসামা বিন লাদেনের ব্যক্তিগত বিমান চালানোর জন্য তাদের পাইলট হতে হবে।

একজন ভাই আমাদের নিকটে আসলেন। আমেরিকান স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করার জন্য সহায়তা চাইলেন। ৯/১১ হামলার পরিকল্পনা তখন নতুন এক মাত্রা পেল। সেই ভাইয়ের নাম ছিল মোখতার আল বেলুচি। খালিদ শেইখ মুহাম্মদ নামেই সমাধিক পরিচিত ছিলেন তিনি। আল্লাহ তাঁকে দ্রুত মুক্তি দান করুক। তাঁর পরিকল্পনা ছিল কয়েকটি আমেরিকান বিমান ছিনতাই করা। এবং যদি আমেরিকান সরকার, মুজাহিদদের দাবি দাওয়া পূরণ না করে তাহলে বিমানগুলোকে মাঝ আকাশেই ধ্বংস করা হবে। মুজাহিদদের প্রধান দাবী ছিল শাইখ ওমর আব্দুর রহমানের (আল্লাহ তাঁকে কবুল করুক) মুক্তি।

1 তিনি তৎকালীন ইউরোপে বসবাসকারী শাইখ আনওয়ার শাবান এর লেকচার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। ইতালি থেকে আফগানিস্তানে হিজরত করেন। ৯০ দশকের শেষের দিকে আমেরিকানদের দ্বারা নিযুক্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত হোসাইন, আল-কায়েদার সাথে যুক্ত ছিলেন। আল্লাহ তাকে সৎপথ প্রদর্শন করুক।

2 মিশরীয় বংশোদ্ভূত আমেরিকান নাগরিক। তিনি আমেরিকায় আটক হন এবং কয়েক বছর কারারুদ্ধ থাকেন। যখন প্রমাণিত হয় যে মুজাহিদদের সাথে অনেক বছর ধরে তাঁর কোনো সম্পর্ক নেই, তখন তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়। আমরা সুদান থাকা অবস্থায় তিনি আমেরিকায় ফিরে আসেন। আমাদের সাথে তাঁর সকল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। আমেরিকার নিরাপত্তা সংস্থাসমূহ শক্তি প্রদর্শনের জন্য নির্দোষ ও অসহায় মুসলিমদের ইচ্ছাকৃতভাবে টার্গেট করে।

যাইহোক, আল-কায়েদা বিশ্বাস করত যে সুদানের মাটি থেকে এত বড়মাপের অপারেশন বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। এবং এই উচ্চাভিলাষী অপারেশনের পরের প্রতিক্রিয়া সামলানোর জন্যেও সুদান সরকার যথেষ্ট শক্তিশালী না। তবে ভাগ্যক্রমে একটি সুযোগ আসে। সুদান সরকার, আল-কায়েদাকে মার্কিন এবং ইহুদি স্বার্থগুলোর উপর আক্রমণের জন্য রেকি করার প্রস্তাব দেয়।

ভাইয়েরা কেনিয়াতে বিভিন্ন টার্গেটে রেকি করেন। এই কাজে অংশগ্রহণকারীদের একজন ছিলেন আনাস আল সাবে'ই আল লিব্বি। পরবর্তীতে আনাস আল লিব্বি সিআইএ (CIA) এর গোপন কারাগারে গুরুতর নির্যাতনের ফলে শহীদ হন। অপারেশন পরিচালনার জন্য উপযুক্ত স্থানের খোঁজ না পাওয়ায় অপারেশনগুলো মুলতবি করে রাখা হয়। উপযুক্ত স্থানের খোঁজ চলতে থাকে। সুদানে পরিচালিত আল-কায়েদার কার্যক্রম, আমেরিকার স্বার্থে আঘাত হানার পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ইনশা আল্লাহ আমি সমগ্র বিষয়টি পরবর্তীতে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করব।

আমি এখানে মিডিয়া দ্বারা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়া একটি ভুল ধারণা সংশোধন করতে চাই। ১১ই সেপ্টেম্বরের পরিকল্পনার পিছনে মিশরীয় বিমানচালক জামিল আল বাতুতি ছিলেন না। তাঁর বিমানটি ১৯৯৯ সালে আমেরিকার উপকূলে বিদ্ধস্ত হয় এবং আরোহীরা সবাই নিহত হয়। তিনি বা তাঁর সহকারী পাইলট ইচ্ছাকৃতভাবে বিমান বিদ্ধস্ত করেননি। খুব সম্ভবত যান্ত্রিক ত্রুটি কিংবা বিমান বন্দরে আমেরিকার গোয়েন্দা বাহিনীর স্যাবোটাজের কারণে বিমান বিদ্ধস্ত

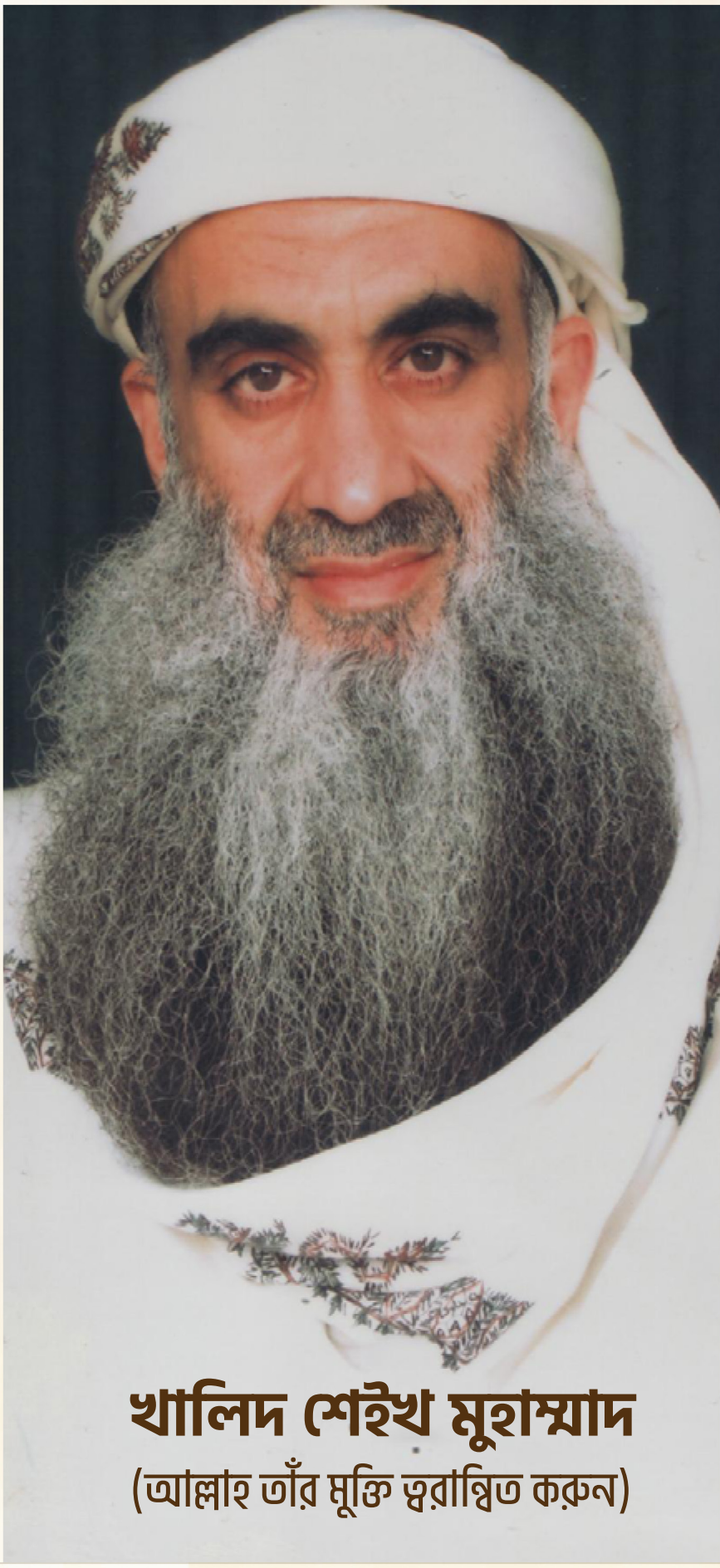

খালিদ শেইখ মুহাম্মাদ

(আল্লাহ তাঁর মুক্তি ত্বরান্বিত করুন)

হয়েছিল। বিমান রানওয়ে থেকে উড্ডয়নের সময় বাতুতি বলেছিলেন- আমি আল্লাহর উপর ভরসা করলাম। বিমান বিধ্বস্ত হওয়ার পূর্বে তিনি কালেমা পাঠ করেন। একজন মুসলিম মাত্রই এই বিষয়গুলোর উপর আমল করেন। মুসলিমদের মাঝে এগুলো খুবই প্রচলিত আমল। অথচ আমেরিকার মিডিয়া বিশ্ববাসীকে বিশ্বাস করাতে চায় শুধুমাত্র আল-কায়েদার সদস্যরাই এমন করে! বিমান বিদ্ধস্ত হবার জন্য তারা আল-কায়েদাকে দায়ী করে বসে।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো মিশরীয় পাইলটের বিমান বিদ্ধস্ত হবার ঘটনাটি কখনই ১১ই সেপ্টেম্বরের জন্য অনুপ্রেরণা ছিল না। এর বহু পূর্বেই হামলার বাস্তবসম্মত ছক কষে ফেলা হয়েছিল। বিমান বিধ্বস্ত হবার পূর্বেই, আল-কায়েদার নেতৃবৃন্দ ১১ই সেপ্টেম্বরের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য কিছু সংখ্যক ভাইদের প্রশিক্ষণ প্রদান শুরু করেছিলেন। ১৯৯৯ সালের এই ঘটনার উপর শাইখ উসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহর মন্তব্য শুনে কিছু লোক ভেবেছিল, যে বাতুতির বিমান বিদ্ধস্ত হবার ঘটনা থেকেই ১১ই সেপ্টেম্বরে হামলার পরিকল্পনা এসেছে। শাইখ উসামাকে, বাতুতির সাথে আল- কায়েদার সংশ্লিষ্টতা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি উত্তর দেন- প্রকৃতপক্ষে বাতুতির যদি আমেরিকার ক্ষতি করার ইচ্ছাই থাকত, তাহলে কেন তিনি আমেরিকার কোনো বিল্ডিং এর উপর তার বিমানকে বিদ্ধস্ত করলেন না?

এই জবাব থেকেও কিছু লোক ভুল ধারণায় বিশ্বাস করে। বাতুতির বিমান ধ্বংস হবার অনেক পূর্বেই বড়মাপের অপারেশনের প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু প্রকৃত বিষয় সম্পর্কে তখন খুব অল্প সংখ্যক মানুষই অবগত ছিলেন।

আমি এখানে মিডিয়া দ্বারা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়া একটি ভুল ধারণা সংশোধন করতে চাই। ১১ই সেপ্টেম্বরের পরিকল্পনার পিছনে মিশরীয় বিমানচালক জামিল আল বাতুতি ছিলেন না। তাঁর বিমানটি ১৯৯৯ সালে আমেরিকার উপকূলে বিদ্ধস্ত হয় এবং আরোহীরা সবাই নিহত হয়। তিনি বা তাঁর সহকারী পাইলট ইচ্ছাকৃতভাবে বিমান বিদ্ধস্ত করেননি। খুব সম্ভবত যান্ত্রিক ত্রুটি কিংবা বিমান বন্দরে আমেরিকার গোয়েন্দা বাহিনীর স্যাবোটাজের কারণে বিমান বিদ্ধস্ত হয়েছিল। বিমান রানওয়ে থেকে উড্ডয়নের সময় বাতুতি বলেছিলেন- আমি আল্লাহর উপর ভরসা করলাম। বিমান বিধ্বস্ত হওয়ার পূর্বে তিনি কালেমা পাঠ করেন। একজন মুসলিম মাত্রই এই বিষয়গুলোর উপর আমল করেন। মুসলিমদের মাঝে এগুলো খুবই প্রচলিত আমল। অথচ আমেরিকার মিডিয়া বিশ্ববাসীকে বিশ্বাস করাতে চায় শুধুমাত্র আল-কায়েদার সদস্যরাই এমন করে! বিমান বিদ্ধস্ত হবার জন্য তারা আল-কায়েদাকে দায়ী করে বসে।

আফগানিস্তানে প্রত্যাবর্তন

আমেরিকার অভ্যন্তরের সম্ভাব্য টার্গেটগুলোর উপর একটি বড় ধরনের অপারেশন চালনার ব্যাপারে আলোচনা করার জন্য তোরাবোরা পাহাড়ে বেশ কয়েকটি বৈঠক হয়েছিল। এই আলোচনাগুলোতে কৌশলগত এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি টার্গেটের সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রস্তুত করা হয়। তবে তখন কোনোকিছুই চূড়ান্ত হয়নি। এই বৈঠকগুলোতে বারবার কয়েকটি বিষয় উঠে আসে- এমন কিছুকে টার্গেট করতে হবে যা শত্রুর অর্থনীতিতে মারাত্মক প্রভাব ফেলবে অথবা আমেরিকার বিখ্যাত স্থাপনাসমূহে আঘাত করতে হবে, যাতে বিশ্বব্যাপী আমেরিকার সম্মান এবং খ্যাতি নষ্ট হয়।

আল -কায়েদা অধিকাংশ কর্মীদের আফগানিস্তানে পাঠিয়ে দেয়। খালিদ শেইখ মুহাম্মদ (মুখতার আল বেলুচি) নতুন উদ্যম এবং শক্তি নিয়ে কাজ শুরু করেন। তিনি মাঝে মাঝেই শাইখ উসামা রহিমাহুল্লাহর নিকট যেতেন। চেষ্টা করতেন তাঁর আক্রমণ পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য শাইখ উসামা রহিমাহুল্লাহকে রাজি করাতে। তাঁর পরিকল্পনাটি ছিল

খালিদ শেইখ মুহাম্মদ (মুখতার আল বেলুচি) নতুন উদ্যম এবং শক্তি নিয়ে কাজ শুরু করেন। তিনি মাঝে মাঝেই শাইখ উসামা রহিমাহুল্লাহর নিকট যেতেন। চেষ্টা করতেন তাঁর আক্রমণ পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য শাইখ উসামা রহিমাহুল্লাহকে রাজি করাতে। তাঁর পরিকল্পনাটি ছিল একসাথে আমেরিকার দশটি বিমান হাইজ্যাক করা।

একসাথে আমেরিকার দশটি বিমান হাইজ্যাক করা। বিমানগুলো যখন মাঝ আকাশে থাকবে তখন মার্কিন সরকারের সাথে কিছু দাবী দাওয়া নিয়ে আলোচনা করা। তারা যদি মুজাহিদদের দাবী মানতে রাজী না হয়, তাহলে আকাশেই বিমানগুলো ধ্বংস করে দেয়া।

কিন্তু প্রকৃত বাস্তবতা হচ্ছে বিমান মাঝ আকাশে থাকা অবস্থায় কোনো সরকার হাইজ্যাকারদের শর্ত মেনে নেবে এমন সম্ভাবনা বেশ কম। আসলে খালিদ শেইখ মুহাম্মাদের এই পরিকল্পনা ছিল একটি শহীদি অপারেশনের। এবং মার্কিন সরকার মুজাহিদদের দাবী মেনে নেবে এমন সম্ভাবনাও তেমন ছিল না। খালিদ শেইখ মুহাম্মদ হামলার এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে খুব আগ্রহী এবং আশাবাদী ছিলেন। কারণ তিনি এবং তাঁর ভাই ফিলিপিনের ম্যানিলা অপারেশনের জন্য মার্কিন বিমানে করে তরল বিস্ফোরক পাচার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে এটি ছিল বড় ধরণের হামলার একটি মহড়া। শেইখ খালিদ বিশ্বাস করতেন ম্যানিলা অপারেশনে তিনি যা করেছেন তা পুনরায় করতে পারবেন। আল-কায়েদার হাই কমান্ড তাঁর এই পরিকল্পনা একেবারে নাকচ করে দেননি। যেহেতু এই পরিকল্পনা থেকে বোঝা যাচ্ছিল আমেরিকার বিখ্যাত টার্গেটগুলোকে আঘাত করার জন্য বিমানকে মিসাইল হিসেবে ব্যবহার করা যাবে। আর এতে সফলতা লাভের জন্য হাইজ্যাকারদের অবশ্যই বিমান চালনার প্রশিক্ষণ থাকতে হবে।

এরপর পুরো পরিকল্পনাকে খুঁটিনাটি বিষয় আমলে নিয়ে অত্যন্ত সূক্ষাতিসূক্ষভাবে পর্যালোচনা করা হয়। পরিমার্জন করা হয়। আমেরিকার অভ্যন্তরে বিমান হাইজ্যাক করে, সেই বিমান দিয়ে পূর্ব নির্ধারিত টার্গেটে হামলা করবে এমন একদল শাহাদাত পিয়াসী পাইলট দল প্রস্তুত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ১৯৯৮ সালের মাঝামাঝি এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

আল-কায়েদা, কেনিয়া ও তানজানিয়াতে আমেরিকার দূতাবাস ধ্বংস করতে সফল হয়। এসময় থেকেই প্রস্তুতি শুরু হয় দুটি বড় অপারেশনের- ইউএসএস কোল অপারেশন এবং আমেরিকার অভ্যন্তরে অপারেশন। আল-কায়েদার গোপন বৈঠকগুলোতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক পাইলটদের প্রশিক্ষণ এবং আক্রমণের টার্গেট নির্বাচনের দিকে নজর দেয়া হয়। কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক টার্গেট নিয়ে আলোচনা করা হয়। পাশাপাশি কিছু সামরিক টার্গেটের ব্যাপারেও আলোচনা হয়। হোয়াইট হাউস, কংগ্রেস, এবং পেন্টাগনের কথা বারবার আলোচনায় আসে। অর্থনৈতিক টার্গেট যেমন আমেরিকার স্টক এক্সচেঞ্জের কথা বলাই বাহুল্য। কয়েকটি প্রদেশের রাজধানীতে বিখ্যাত কিছু স্থাপনায় একযোগে হামলা চালানোর পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা হলেও তা শেষ পর্যন্ত বাতিল হয়ে যায়। এটি এই ভিত্তিতে প্রত্যাখ্যান করা হয় যে, আল-কায়েদা একই সঙ্গে অনেক ফ্রন্ট খুলতে আগ্রহী নয়। এর ফলে আল-কায়েদার প্রচেষ্টা ভুল লক্ষ্যে পরিচালিত হবে। এটি ছিল আমাদের প্রথম অপারেশন, তাই আমরা সকল মনোযোগ দিতে চেয়েছিলাম আমাদের প্রধান শত্রু আমেরিকার উপর...

(The 9/11 Operations: Between Fact and Fiction বইয়ের অংশবিশেষ)

আমেরিকার জনগণ কি ৯/১১ হামলার কারণসমূহ অনুধাবন করতে পেরেছে?

উবাদা আল গামিদি

৯/১১ হামলার পর আঠারো বছর[1] পার হয়েছে। কিন্তু তারপরেও আমেরিকার জনগণ ৯/১১ এর প্রকৃত কারণ অনুধাবন করতে পারেনি। এই ব্যর্থতার কথা পাশ্চাত্যের লেখাসমূহ মনোযোগ দিয়ে পড়লে যে কেউই তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারবে।

ইউএসএস কোল অপারেশন, নাইরোবি এবং দারুসসালাম অপারেশনের মাধ্যমে আল-কায়েদা কী বার্তা দিতে চেয়েছিল তাও তারা উপলব্ধি করতে পারেনি। আল–কায়েদার বার্তা ছিল সুস্পষ্ট। কিন্তু আমেরিকার রাজনীতিবিদ এবং তাদের নিয়ন্ত্রিত মিডিয়া ইচ্ছাকৃতভাবে এই বার্তাকে বিকৃত করেছে।

একজন বিখ্যাত ফরাসি দার্শনিক জঁ-জাক রুসো বলেছে, "সমাজের অভিজাত লোকেরা সত্য জানে, কিন্তু তারা এটা জানতে চায় না; অপরদিকে সাধারণ মানুষ সত্য জানতে চায় কিন্তু তারা জানতে পারে না।"

ফরাসি দার্শনিকের এই বক্তব্য প্রকৃতপক্ষে ১১ই সেপ্টেম্বরের হামলার ব্যাপারে অধিকাংশ আমেরিকানদের দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপারে প্রযোজ্য। আমেরিকান রাজনীতির রথী-মহারথীরা খুব ভালোভাবেই জানে কেন এই হামলা হয়েছিল। তারা খুব ভালোভাবেই জানে কেন মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানেই ৩ হাজার লোক প্রাণ হারাল। কিন্তু কারণগুলোর মুখোমুখি হওয়া বা সমস্যা সমাধানের সঠিক পথ বাতলে দেবার নৈতিক সাহস রাখে না তারা।

আমেরিকার জনগণ এই বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়েছিল। ৯/১১ হামলার তিক্ত স্বাদ গ্রহণ করেছিল। কিন্তু এই হামলার পেছনের কারণগুলো সম্পর্কে তারা জানবে না বা বুঝবে না এই হামলা কিভাবে তাদের বর্তমান এবং ভবিষ্যতকে প্রভাবিত করবে তা একেবারেই অস্বাভাবিক। মুজাহিদদের বুঝতে হবে বিশ্বজুড়ে মিডিয়া রাজনীতিবিদ এবং ধনীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কিছু বোকা মানুষ মনে করে মিডিয়া আমেরিকার জনগণের নিকট সত্য ঘটনাই উপস্থাপন করে। কিন্তু মূলত তারা সত্য ঘটনাকে বিকৃত এবং পরিবর্তন করে মানুষের কাছে উপস্থাপন করে। তারা সত্যকে এমনভাবে পরিবর্তন করে যেন তা তাদের নিয়ন্ত্রণকারী প্রভুদের মনমতো হয়। তাদের প্রভুদের এজেন্ডা বাস্তবায়নে সাহায্য করে।

৯/১১ হামলায় অংশগ্রহণকারী ১৯ জন বীর মুজাহিদের সর্বশেষ বক্তব্যগুলো সমস্ত মিডিয়ায় প্রকাশিত হয়েছে। এবং আমেরিকার জনগণের এক বিশাল অংশ শাইখ উসামা রহিমাহুল্লাহ'র বক্তব্য শুনেছে। এই বক্তব্যে তিনি স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেছেন কেন টুইন টাওয়ারে হামলা করা হলো। কিন্তু আমেরিকার রাজনীতিবিদরা এসবকিছুকে প্রত্যাখ্যান করল। তারা ৯/১১ হামলার প্রকৃত কারণগুলো সামনে নিয়ে আসতে চায় না। কারণ তা করলে এটি স্পষ্ট হবে যে আমেরিকার জুলুমের প্রতিবাদেই এই হামলা চালানো হয়েছিল। এটি ছিল ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া। ৯/১১ হামলার প্রকৃত কারণ অস্বীকারের মাধ্যমে মার্কিন প্রশাসন মুসলিম বিশ্বে তাদের আগ্রাসনকে যৌক্তিকতা দিচ্ছে। তারা আসলে রোগের উপসর্গ দূর করতে চায়। রোগ সারাতে চায় না। প্রকৃত সত্য অনুধাবন করলে অনেক অস্বস্তিকর প্রশ্নের মুখোমুখি হতে

1 এ প্রবন্ধটি ২০১৯ সালে লেখা হয়েছে।

হবে। মনোবেদনায় ভুগতে হবে। তাই তারা সবকিছু চোখ বুজে অস্বীকার করে, অজ্ঞতার আশ্রয় নিয়ে মাতালের মতো কল্পিত শান্তিতে আচ্ছন্ন হয়ে থাকতে চাচ্ছে।

গত আঠারো বছর ধরে নিয়মতান্ত্রিকভাবে আমেরিকানদের বোঝানো হচ্ছে যে, ১১ই সেপ্টেম্বরের আক্রমণের সাথে মধ্যপ্রাচ্যে আমেরিকার পররাষ্ট্রনীতির কোনও সম্পর্ক নাই। এভাবেই আমেরিকার লোকদেরকে ভুল পথে পরিচালিত করা হয়েছে। তারা বিশ্বাস করেছে – ১৯ জন হামলাকারী স্বাধীনতার শত্রু। তারা পশ্চিমা বিশ্বের উন্নত প্রযুক্তিকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখে। এই গভীর অজ্ঞতার কারণে আমেরিকানরা ৯/১১ এর অন্তর্নিহিত কারণসমূহ নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভোগে। এর ফলে তারা নিজেদের এবং তাদের মিত্রদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হয়েছে। আল-কায়েদার সাথে আমেরিকার জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের জন্য কোনো চুক্তি করতেও ব্যর্থ হয়েছে আমেরিকা।

প্রকৃতপক্ষে, এই সমস্ত অজ্ঞতা এবং ইচ্ছাকৃতভাবে সৃষ্ট বিভ্রান্তির কারণে আল-কায়েদার বার্তাগুলো সাধারণ মুসলিমদের মাঝে আরো গভীরভাবে ছড়িয়ে পড়ছে। আমেরিকার নীতি নির্ধারকরা কি এর দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব বোঝে? আরব বসন্ত আমাদের দেখিয়েছে কীভাবে আল-কায়েদার বার্তা জনপ্রিয় এক বার্তায় রূপান্তরিত হয়েছে। যা আরব বিশ্বজুড়ে লক্ষ লক্ষ মুসলিমকে অনুপ্রাণিত করার সম্ভাবনা রাখে। এবং মধ্যপ্রাচ্যে আমেরিকান রাজনীতির সাথে মুসলিমদের সরাসরি দ্বন্দ্বে জড়াতে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। মিশর, তিউনিসিয়া এবং আলজেরিয়ায় লাখ লাখ মিছিলে আমরা এর প্রমাণ পেয়েছি। এবং আমরা দেখেছি কিভাবে হাজার হাজার মানুষ শাইখ উসামা রহিমাহুল্লার শাহাদাতের সংবাদে শোক প্রকাশ করতে উপস্থিত হয়েছিল। আমেরিকানদের জন্য এটি ছিল এক অশনি সংকেত। এই ঘটনা প্রকাশ করে দিয়েছে মুসলিম উম্মাহ এখনো জুলুমের কারণে আমেরিকাকে কতোটা ঘৃণা করে! এই রাগ, এই ঘৃণা আমেরিকার ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে আরও একটি ১১ই সেপ্টেম্বরের মুখোমুখি করতে পারে।

আল-কায়েদার আহ্বান হারিয়ে যায়নি। তা এখনো জীবন্ত। আফগানিস্তান, ইরাক বা অন্য কোনও নিরাপদ আশ্রয়স্থলে আশ্রয় লাভ করে এটি টিকে থাকেনি ; বরং তা মিশে রয়েছে প্রতিরোধ স্পৃহার অণু পরমাণুতে, স্বাধীনতার

মূলমন্ত্র হয়ে, নিত্য নতুন উদ্ভাবনী শক্তিকে কাজে লাগে চতুরতার সাথে শত্রুকে আঘাত হানার প্রেরণা হিসেবে। এই প্রেরণা থেকেই শাইখ উসামা রহিমাহুল্লাহ যখন স্বাধীন কান্দাহারের মুক্ত বাতাসে শ্বাস নিলেন, তখন তিনি বেসামরিক বিমানগুলোকে বিধ্বংসী অস্ত্র হিসাবে রূপান্তরিত করার পরিকল্পনা করলেন। মুসলিম উম্মাহকে চিনিয়ে দিলেন তাদের টার্গেট- আমেরিকা!

> হয় তারা ৯/১১ এর বিপর্যয় থেকে শিক্ষা নেবে, হামলার প্রকৃত কারণসমূহ খুঁজে বের করবে। যদি তারা এটা করে, যদি পূর্বের প্রশাসনগুলোর অন্যায়, অত্যাচার আন্তরিকভাবে স্বীকার করে নেয়, তাহলে বুদ্ধিমানের মতো তারা পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে সক্ষম হবে। এবং সম্ভবত মুসলিম বিশ্বের সাথে সম্পর্কের একটি নতুন অধ্যায় খুলতে পারবে। অথবা, নেতৃবৃন্দ ও রাজনৈতিক রথী মহারথীরা আমেরিকার জনগণের অজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে চেষ্টা করবে মুসলিম বিশ্বে আরো ব্যাপকভাবে হস্তক্ষেপ করতে। এবং আমেরিকার গোলাম সরকারদের ব্ল্যাকমেইলের মাধ্যমে মুসলিমদের সম্পদ লুটপাট করতে। দুঃখজনকভাবে আমেরিকার নীতি নির্ধারকরা দ্বিতীয় পথটি বেছে নিয়েছে। এর ফলে আল-কায়েদা বা তাঁদের আদর্শে অনুপ্রাণিত অন্য কেউ আমেরিকার জনগণকে আবার হয়ত উপহার দিবে আরেকটি ৯/১১... যা হবে পূর্বের চাইতেও আরও বিধ্বংসী, আরও প্রাণঘাতী।

ব্রুস হফম্যান আল-কায়েদার ব্যাপারে আমেরিকার শীর্ষস্থানীয় বিশেষজ্ঞদের একজন। তার মতে আল-কায়েদা হলো একটি চতুর, নমনীয় এবং অভিযোজনক্ষম সংগঠন। সে বলে, 'আফগানিস্তান হাতছাড়া হওয়া[2] 'সন্ত্রাসী হামলা' চালানোর ক্ষেত্রে আল-কায়েদার ক্ষমতাকে হ্রাস করতে পারবে না, কারণ এই আন্দোলনের শক্তি ভৌগোলিক অবস্থানের ওপর নির্ভরশীল নয়। বরং তা পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির সাথে আল- কায়েদার দ্রুত খাপ খাইয়ে নেবার সক্ষমতার উপর নির্ভরশীল'।

হফম্যান তার রিসার্চ পেপার 'An Evaluation of al Qa'eda' তে উল্লেখ করে, "১১ই সেপ্টেম্বরের আক্রমণে আল-কায়েদার সফলতার গোপন রহস্য সংখ্যাগত বা আর্থিক শক্তি নয়। বরং তা ছিল নিম্ন বর্ণিত ৩টি বিষয়-

প্রথমত: প্রধান শত্রু আমেরিকার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার দুর্বলতা এবং ফাঁক ফোঁকর চিহ্নিত করতে সক্ষম হওয়া এবং নির্দয়ভাবে এগুলোর সদ্ব্যবহার করতে পারা।

দ্বিতীয়ত: অপারেশন সম্পাদনের প্রস্তুতিমূলক পর্যায়ে শত্রুদের ধোঁকা দেওয়া এবং বিভ্রান্ত করার সক্ষমতা, যার ফলে অপারেশন শেষ করার পূর্বে তালগোল না পাকানো।

2 ২০০১ সালে ন্যাটো জোট আফগানিস্তান আক্রমণ করে। সাময়িক সময়ের জন্য আফগানিস্তান দখল করে নেয়। এখানে সে ব্যাপারে বলা হচ্ছে।

তৃতীয়ত: শহীদি আক্রমণকে এই অপারেশনের কর্মপদ্ধতি হিসেবে নির্ধারণ করা। একজন ব্যক্তি যে মৃত্যুকেই লক্ষ্য হিসেবে স্থির করেছে তাকে নিরস্ত করা অত্যন্ত কঠিন।

হফম্যান সিদ্ধান্তে পৌঁছায়- আল-কায়েদার এই তিনটি শক্তির কোনোটিই আফগানিস্তানের নিরাপদ আশ্রয়ের উপর নির্ভর করে না। আল-কায়েদা এই শক্তিগুলো ব্যবহার করবে ভবিষ্যৎ অভিযানগুলোতেও। তাঁরা শত্রুদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার ফাঁক ফোঁকর খুঁজবে। এবং সফলভাবে হামলা চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানগুলোকে চতুরতার সাথে কাজে লাগাবে।

উপসংহারে হফম্যান বলে, ‘ আল-কায়েদার সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো ধারাবাহিকতা এবং প্রাসঙ্গিক আদর্শ হিসেবে টিকে থাকা’। আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি যে, আল-কায়েদা ইতিমধ্যেই এই পর্যায় অতিক্রম করেছে, প্রাসঙ্গিক আদর্শ হিসেবে এটি টিকে রয়েছে। এবং আল-কায়েদার বার্তাসমূহ উম্মাহর মাঝে ছড়িয়ে পড়েছে। ঘুমন্ত মুসলিম উম্মাহকে জাগিয়ে তুলছে ।

আঠারো বছর পেরিয়ে যাবার পরেও আমেরিকার জনসাধারণ ৯/১১ নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগছে। তাদের সামনে এখন দুইটি পথ খোলা। হয় তারা ৯/১১ এর বিপর্যয় থেকে শিক্ষা নেবে, হামলার প্রকৃত কারণসমূহ খুঁজে বের করবে। যদি তারা এটা করে, যদি পূর্বের প্রশাসনগুলোর অন্যায়, অত্যাচার আন্তরিকভাবে স্বীকার করে নেয়, তাহলে বুদ্ধিমানের মতো তারা পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে সক্ষম হবে। এবং সম্ভবত মুসলিম বিশ্বের সাথে সম্পর্কের একটি নতুন অধ্যায় খুলতে পারবে। অথবা, নেতৃবৃন্দ ও রাজনৈতিক রথী মহারথীরা আমেরিকার জনগণের অজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে চেষ্টা করবে মুসলিম বিশ্বে আরো ব্যাপকভাবে হস্তক্ষেপ করতে। এবং আমেরিকার গোলাম সরকারদের ব্ল্যাকমেইলের মাধ্যমে মুসলিমদের সম্পদ লুটপাট করতে। দুঃখজনকভাবে আমেরিকার নীতি নির্ধারকরা দ্বিতীয় পথটি বেছে নিয়েছে। এর ফলে আল-কায়েদা বা তাঁদের আদর্শে অনুপ্রাণিত অন্য কেউ আমেরিকার জনগণকে আবার হয়ত উপহার দিবে আরেকটি ৯/১১... যা হবে পূর্বের চাইতেও আরও বিধ্বংসী, আরও প্রাণঘাতী।

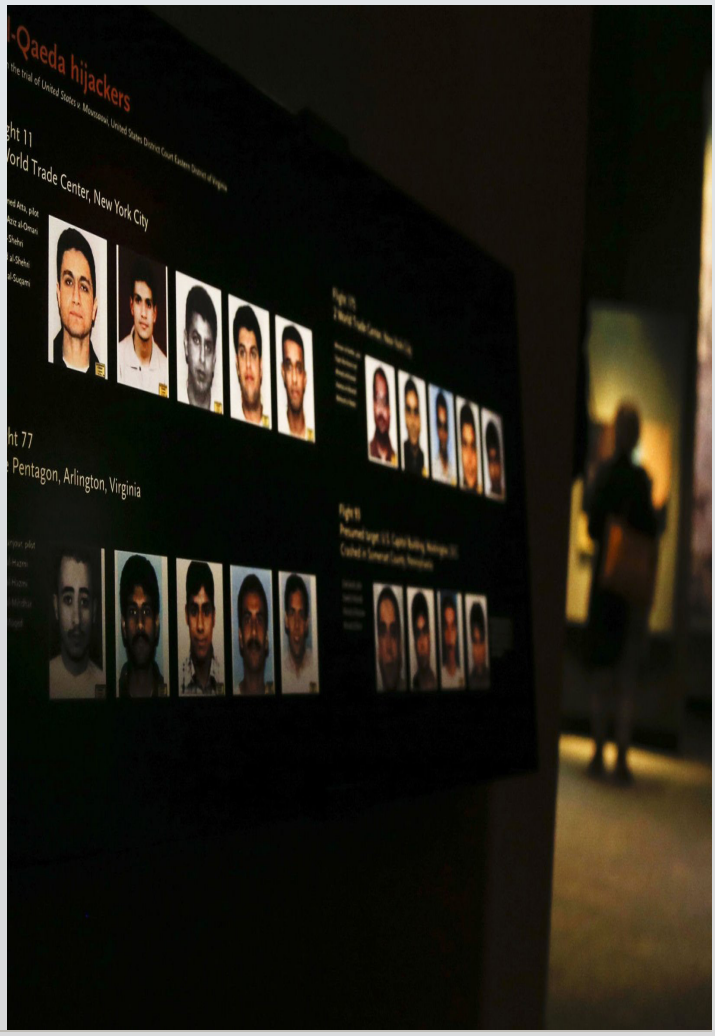

সেপ্টেম্বর ১০
ইতিহাসের সন্ধিক্ষণে

সালিম শরীফ

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে। এক মেরুকেন্দ্রিক এই বিশ্বব্যবস্থার একমাত্র পরাশক্তি আমেরিকা। তবে আমেরিকার ইতিহাসে গর্বের কিছু নেই। এটা সর্বজন স্বীকৃত যে এই পরাশক্তির নেতৃবৃন্দ মূল্যবোধ, নীতি নৈতিকতাবোধ শূন্য। এটাতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। আমেরিকানরা প্রকৃতপক্ষে অধঃপতিত বর্ণসঙ্কর এক জাতি। অনুসরণীয় গৌরবের কোনো ঐতিহ্য তাদের নেই। ইতিহাস ঘাঁটলে একজন রাখালের সাথেই আমেরিকার সবচেয়ে বেশি সাদৃশ্য পাওয়া যায়। এই রাখাল এমন একজন লোক যে নিজের স্বার্থ ছাড়া অন্য কিছুই বোঝে না। এবং পাশবিক শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে স্বার্থ উদ্ধার করে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গোড়াপত্তন হয়েছিল ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকদের দ্বারা। যাদের অনেকেই ছিল সন্ত্রাসী, ফেরারী আসামী। স্থানীয়দের গণহত্যা, জোরপূর্বক ভূমি এবং সম্পদ ছিনিয়ে নেয়ার মাধ্যমেই শুরু হয়েছিল 'আমেরিকান ড্রিমের' পথচলা।

স্থানীয় রেড ইন্ডিয়ানদের মধ্যে নতুন নতুন রোগের জীবাণু ছড়িয়ে দিতো এরা। গণহত্যা এবং বিভিন্ন রোগব্যাধিতে প্রায় ৬ কোটি রেড ইন্ডিয়ান নিহত হয়। আমেরিকার শুরুর দিকের ইতিহাস হলো খুনোখুনি, ধর্ষণ, লুটতরাজ , সুদ, মদ, জুয়া, পতিতাবৃত্তির ইতিহাস। এমন কোনো অপরাধ নেই, যা আমেরিকানরা করত না। অপরাধগুলোও করত অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে... পশুত্বের সর্বনিম্ন স্তরে পৌঁছে। এই ইতিহাস মাথায় রাখলে এটা বোঝা কষ্টকর হয়ে যায় যে আমেরিকা কীভাবে স্বাধীনতার অগ্রদূত হতে পারে? আর কীভাবেই বা আমেরিকা স্বাধীন মানুষদের ভূখণ্ড হতে পারে?

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাস থেকে বরং একমাত্র যে উপসংহারে পৌঁছানো যেতে পারে তা হচ্ছে -এটি অসভ্য, বর্বর রাখালদের ভূমি। তবে আমেরিকার একমাত্র উল্লেখযোগ্য অর্জন হলো তাদের মিডিয়া। তারা এমন এক মিডিয়া তৈরি করেছে

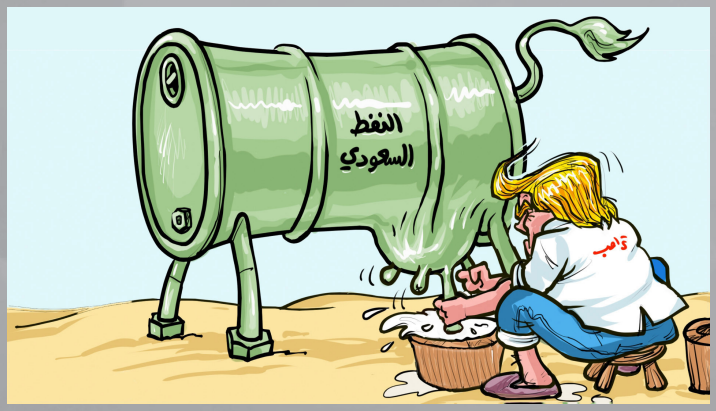

যা পুরো বিশ্ববাসীর সামনে বিশ্বাসযোগ্যভাবে মন্দকে ভালো হিসেবে উপস্থাপন করতে সক্ষম। জেনা ব্যভিচারকে সম্মান, উত্তম চরিত্র এবং ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের মৌলিক ভিত্তি হিসেবে উপস্থাপন করে এই মিথ্যাবাদী মিডিয়া মেশিন।

আমেরিকা বিশ্বকে বলতে চায় যার হাতে শক্তি বা ক্ষমতা থাকবে সে নিজের ইচ্ছে মতো এই পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রণ করবে। ইনসাফ কিংবা প্রজ্ঞা বিবর্জিত, নির্দয়ভাবে শক্তি প্রয়োগের এই যুক্তির উপর ভিত্তি করে আমেরিকা সমগ্র মানবতার জন্য হুমকি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। আমেরিকা পৃথিবীর বিষফোঁড়াতে রুপান্তরিত হয়েছে।

পুঁজিবাদী এই সাম্রাজ্যের কারণে আজ বিশ্বজুড়ে এত বৈষম্য, প্রাকৃতিক সম্পদের এতো নিদারুণ অপচয়, পরিবেশের এতো বেশী দূষণ! মানব সভ্যতার ইতিহাসে এমন ঘটনা পূর্বে কখনো ঘটেনি। এই অন্ধকারাচ্ছন্ন সময়েও আমেরিকার মিডিয়া আমেরিকার রাজনৈতিক এবং সামরিক অপরাধের পক্ষে সাফাই গেয়ে যাচ্ছে। বিগত শতাব্দীতে আমেরিকা বিশ্বজুড়ে প্রায় ৬০ টির মতো মিলিটারি ক্যাম্পেইন চালিয়েছে। জাপানের দুটি শহরে পারমানবিক বোমা হামলা ছিল আমেরিকার চরমতম নিষ্ঠুরতার প্রদর্শনী। মুসলিমদের বিরুদ্ধে ইহুদীদেরকে ব্যাপক সমর্থন দেয় আমেরিকা। ইরাকের মুসলিমরা দশকের পর দশকজুড়ে চরম ভোগান্তি পোহায় আমেরিকার কারণে ... আবুগারিব কারাগারের অবর্ণনীয় নির্যাতন, অর্থনৈতিক অবরোধ, ইউরোনিয়ামের ব্যবহার... অত্যাচার নির্যাতনের শেষ নেই। জাতিসংঘে আমেরিকা ৩০ বার ভেটো প্রদান করে ইহুদিদের পক্ষ নিয়ে মুসলিম দেশ ফিলিস্তানের বিরোধিতা করেছে। সত্য হচ্ছে, বিষাক্ত ইহুদি রাষ্ট্রের উৎপত্তি এবং আমেরিকার উৎপত্তির মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। আমি তাদের দেখে প্রচন্ড অবাক হই, যারা ইনসাফ বা নিরপেক্ষতাকে আমেরিকার সাথে জুড়ে দেয়। প্রকৃতপক্ষে আমেরিকা হলো ইহুদিদের দাস আর ইহুদিরা হলো শয়তানের দাস। এবং দাসেরও দাস আমেরিকার কাছ থেকে কি ভালো কোনো কিছু আশা করা যায়?

২৫০ বছরও হয়নি আমেরিকা স্বাধীনতা লাভ করেছে। আর এর শতকরা ৯০ ভাগ সময় তারা কাটিয়েছে অভ্যন্তরীণ কলহ, লুটতরাজ, চুরি, গৃহযুদ্ধ, গণহত্যা, বিশ্বজুড়ে অশ্লীলতা, বেহায়াপনা এবং অনৈতিকতা রপ্তানির কাজে।

আমেরিকার শুরুর দিকের ইতিহাস হলো খুনোখুনি, ধর্ষণ, লুটতরাজ , সুদ, মদ, জুয়া, পতিতাবৃত্তির ইতিহাস। এমন কোনো অপরাধ নেই, যা আমেরিকানরা করত না। অপরাধগুলোও করত অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে... পশুত্বের সর্বনিম্ন স্তরে পৌঁছে। এই ইতিহাস মাথায় রাখলে এটা বোঝা কষ্টকর হয়ে যায় যে আমেরিকা কীভাবে স্বাধীনতার অগ্রদূত হতে পারে? আর কীভাবেই বা আমেরিকা স্বাধীন মানুষদের ভূখণ্ড হতে পারে?

তো এমন অবস্থায় স্বাধীনতার ফেরিওয়ালা আমেরিকা বিশ্ববাসীকে কী শেখাবে? মানবসভ্যতার ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করেন এমন কোনো ব্যক্তির পক্ষেও মানবতার জন্য আমেরিকার উপকারী অবদান খুঁজে পেতে কষ্ট করতে হবে। আমেরিকা হলো বিশ্বের সর্বাধিক

উন্মাদ, অবিবেচক, অপরাধী রাষ্ট্র। বিশ্বের দুর্বল জাতিসমূহের উপর শক্তি প্রয়োগের নেশায় মত্ত। আমেরিকা শক্তির পূজারী। সবকিছু সে হুমকি-ধমকি, জোরজবরদস্তি কিংবা সন্ত্রাসী কার্যক্রম চালিয়ে পেতে চায়। এখন পর্যন্ত যা পেয়েছে তার সবকিছুই সে এভাবে পেয়েছে। আমেরিকা শত্রু তৈরির শিল্পে দক্ষতা অর্জন করেছে। এর মাধ্যমে সে গৃহীত নীতিগুলোকে তার অসচেতন, ক্ষমতার মিথ্যা মোহে আবিষ্ট নাগরিকদের কাছে যৌক্তিকতা প্রদান করে।

হিটলার দাবি করেছিল 'সব কিছুর উপরে জার্মানি'। আমেরিকার নেতারা দাবী করে 'আমেরিকাই সবার প্রথমে'। আসলে হিটলার এবং মার্কিন নেতৃবৃন্দের মধ্য তেমন কোনো পার্থক্য নেই। এমনকি সাম্প্রতিক সময়ে ইউরোপ এবং আরব বিশ্বের মার্কিন মিত্ররাই আমেরিকার ক্ষতিকর পররাষ্ট্র নীতির পরিণতি নিয়ে সরাসরি আলোচনা করছে। লাঞ্ছনা, ব্ল্যাকমেইল, চাঁদাবাজি, নিষেধাজ্ঞা, অবরোধ আরোপ, কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন, ট্যাক্স... এগুলো হলো আমেরিকার সাথে বন্ধুত্বের মূল্য। এমনকি স্বার্থের জন্য মিত্রদের ত্যাগ করার নিকৃষ্ট ইতিহাসও রয়েছে আমেরিকার। এটি সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় যে, আমেরিকানরা মিত্রদের উপর জোরজবরদস্তি করা, অপমান করা বা পথে বসানোকে স্বাভাবিক মনে করে। আমেরিকা মিত্রদের সাথে এমন আচরণ করলে শত্রুর মোকাবেলায় তাকে কে সাহায্য করবে?

ডোনাল্ড ট্রাম্প আসলে যেমন...!

দুঃখের সাথেই বলতে চাই, ট্রাম্প খচ্চর ছাড়া আর কিছুই নয়। আর খচ্চর হল একটি আধা সঙ্কর প্রাণী। তার পিতা হলো গাধা। আর মা হলো একটা নিচু জাতের ঘোড়া, যে একটা গাধার আধিপত্য মেনে নিয়েছে। খচ্চর সর্বাধিক উচ্ছৃঙ্খল, উপদ্রবকারী, কলহপ্রিয় এক প্রাণী, সঙ্গী-সাথীরা যাকে কখনোই পছন্দ করে না। একারণেই ট্রাম্প তার মিত্রদের জন্য সর্বাধিক মাথাব্যথার কারণ। ট্রাম্প খচ্চরের মতো, যদি তার বন্ধুরা তার সামনে থাকে, তাহলে সে তাদের কামড় দিবে; আর যদি পিছনে থাকে তাহলে লাথি দিবে। ট্রাম্পের মিত্র -হোক তারা ইউরোপিয়ান বা আরব- তাদের কোনো নিস্তার নেই।

আমেরিকার অধিবাসীদের জেনে রাখা উচিত যে তারা দাস ব্যতীত আর কিছুই নয়। অথবা তাদের অবস্থা এর চাইতেও খারাপ। তাদের নেতৃবৃন্দ এবং রাজনীতিবিদরা পর্দার আড়ালে থেকে কাজ করে যাওয়া পুঁজিবাদী গোষ্ঠী, বহুজাগতিক কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান এবং আন্তর্জাতিক অর্থায়নকারীদের হাতিয়ার মাত্র। আমেরিকার নাগরিকদের এরা দাস বানিয়ে রেখেছে। এই আন্তর্জাতিক খেলোয়াড়রা শুধুমাত্র নিজস্ব স্বার্থের জন্য কাজ করে। আমেরিকার নাগরিকদের নিয়ে তাদের কোনো মাথাব্যথা নেই। মার্কিন নাগরিকদের অবস্থা কুকুরের মতো, যারা কেবল নিজের প্রবৃত্তির পেছনেই ছুটে বেড়ায়। কোনো মূল্যবোধ, সম্মানবোধ বা আদর্শ নেই। কেবল অন্যের আধা খাওয়া, পরিত্যক্ত খাবার আর পানীয়তেই সন্তুষ্টি খোঁজে। এমনকি অনেকেই তাদের পিতার পরিচয় পর্যন্ত জানে না... এ থেকেই আশাকরি তাদের প্রকৃত অবস্থা অনুধাবন করা সম্ভব।

তাহলে কেন বিশ্বের অসংখ্য লোক 'আমেরিকান ড্রিমের' মিথ্যে মোহে আচ্ছন্ন? এই প্রশ্নের উত্তর হলো -মার্কিন মিডিয়া মেশিন....হলিউড, মুভি, প্রিন্ট মিডিয়া। এগুলো পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ধোঁকাবাজির যন্ত্র। এগুলোর মাধ্যমে বিশ্ববাসীর মগজধোলাই করে আমেরিকা। আমরা যে পৃথিবীতে বাস করছি সেখানে মানবাধিকার, নির্বাচন, বা গণতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের কাঠামো ইত্যাদির মতো ধারণাগুলো একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক। এদের কিছুই করার নেই এই বিশ্ব ব্যবস্থায়। যারা আমাদের নিয়ন্ত্রণ করে সবকিছুই তাদের ইচ্ছাধীন। তারা যা চায়, তাই করে। তাদের ইচ্ছার কাছে সবকিছুই নমনীয় এবং পরিবর্তনশীল।

আমেরিকা সফলতার সাথে কোটি কোটি মানুষের মগজধোলাই করতে পেরেছে। তাদের আবেগ, অনুভূতি নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছে। সিনেমা হলো

২৫০ বছরও হয়নি আমেরিকা স্বাধীনতা লাভ করেছে। আর এর শতকরা ৯০ ভাগ সময় তারা কাটিয়েছে অভ্যন্তরীণ কলহ, লুটতরাজ, চুরি, গৃহযুদ্ধ, গণহত্যা, বিশ্বজুড়ে অশ্লীলতা, বেহায়াপনা এবং অনৈতিকতা রপ্তানির কাজে। তো এমন অবস্থায় স্বাধীনতার ফেরিওয়ালা আমেরিকা বিশ্ববাসীকে কী শেখাবে?

সেই সর্বাধিক শক্তিশালী অস্ত্র, যার মাধ্যমে আমেরিকা শত্রু তৈরি করে। শত্রুদের অশুভ শক্তি হিসেবে প্রচার করে। এবং আমেরিকানদের উপস্থাপন করে শত্রুতার শিকার জনগোষ্ঠী হিসেবে যারা ইনসাফ এবং স্বাধীনতা রক্ষার জন্য লড়াই করতে বাধ্য হয়েছে। অবৈধভাবে গ্রেফতার, অপহরণ, জেল, শত্রুদের অধিকার বঞ্চিত করা- আমেরিকার এইসমস্ত জুলুমের ভিত্তি হলো হলিউডের এই ধোঁকাবাজি। এমনকি শত্রু কোনো অপরাধ সংঘটিত না করলেও শত্রুর উপর এসব জুলুম করা জায়েজ। কারণ

মানবতার হুমকি শয়তানি শক্তির বিরুদ্ধে এগুলো হলো আমেরিকার আত্মরক্ষামূলক পদক্ষেপ।

অতীতকালে ব্ল্যাক ম্যাজিকের সাহায্যে মানুষের মনোজগৎ নিয়ন্ত্রণ করা হতো। চরম ধোঁকাবাজ আমেরিকান মিডিয়া হলো আধুনিক সময়ের যাদুকর। মনোজগৎ নিয়ন্ত্রণের জন্য তারা ব্যাপকভাবে জনসাধারণের উপর পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাচ্ছে।

ইসলামের শুরু থেকেই পশ্চিমা বিশ্বের কাফেররা এই ধর্মের প্রতি গভীর শত্রুতা পোষণ করেছে। পূর্ববর্তী দুই শতাব্দীতে, এরা শেষ পর্যন্ত মুসলিম বিশ্বে তাদের শক্ত অবস্থান প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। পশ্চিমারা মুসলিম বিশ্ব থেকে শুধু সম্পদই চুরি করেনি বরং মুসলিম বিশ্ব থেকে বিভিন্ন জ্ঞান নিয়ে গিয়েছে। এগুলোর সাহায্যে তারা নিজেদের দেশে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তৈরি করেছে। তাদের প্রযুক্তিগত উন্নয়নকে ত্বরান্বিত হয়েছে। মুসলিমদের ভূখণ্ডসমূহ দখল করে ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শক্তিগুলো নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়। তারা নির্দয়ভাবে শক্তি প্রয়োগ করে জ্ঞান ও গবেষণার সমস্ত দরজা বন্ধ করে দেয়। মুসলিমদের ঠেলে দেয় ঘোর কালো আঁধারে। সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদ হিসেবে চাপিয়ে দেওয়া হয় পশ্চিমা নিয়ম-কানুন, মূল্যবোধসমূহ। দীর্ঘসময় শাসন এবং শোষণের পর পশ্চিমারা মুসলিম ভূখণ্ড থেকে চলে যায়। কিন্তু যাবার আগে অনুগত গোলাম লোকদের হাতে শাসনভার তুলে দেয়, যেন মুসলিমদের পায়ে চিরস্থায়ী দাসত্ব, অজ্ঞতা আর দারিদ্রতার শেকল পরিয়ে রাখা যায়। এর উদ্দেশ্য ছিল সম্ভাব্য সর্বনিম্ন ব্যয়ে পশ্চিমা দেশগুলোতে মুসলিমদের

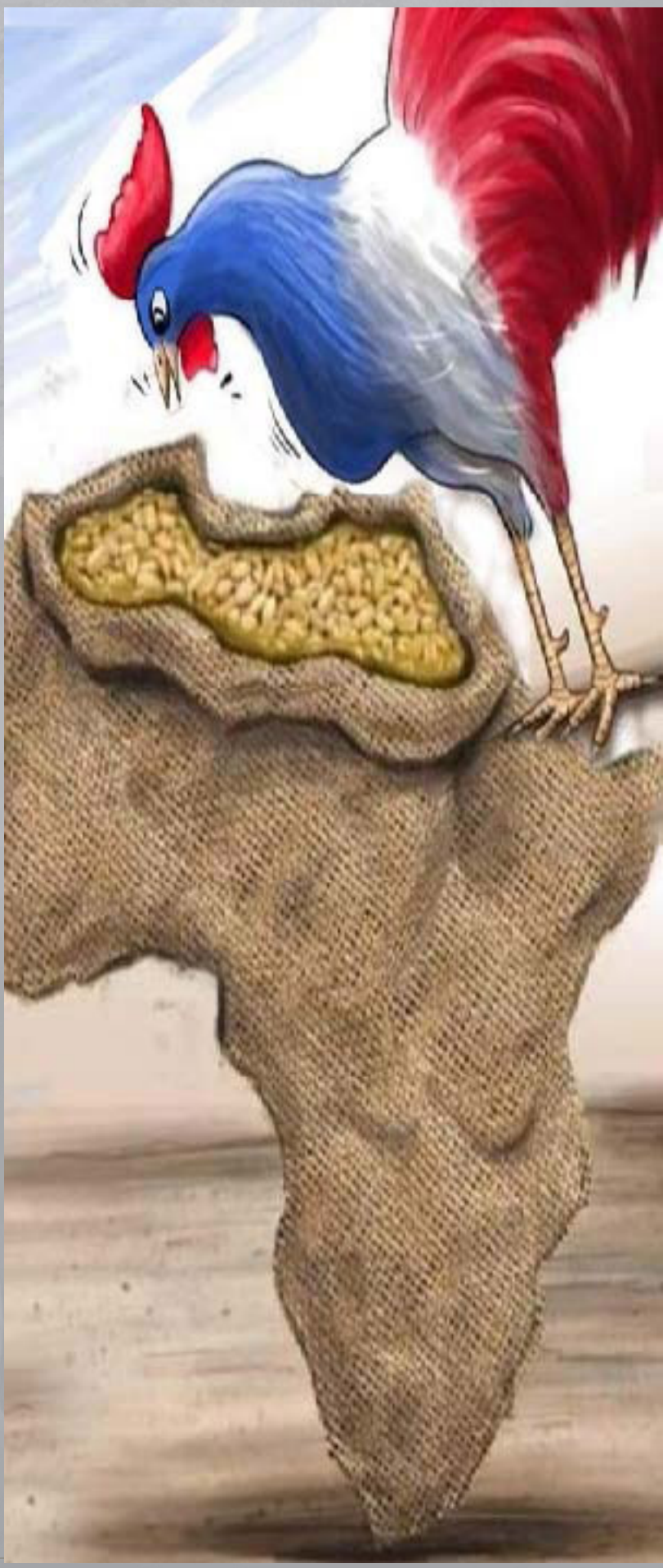

প্রাকৃতিক সম্পদ পাচার করা যায়। স্বৈরাচার, জুলুম-নিপীড়ন, চুরি, লুটতরাজ, অধিকার লঙ্ঘন, স্বাধীন সমালোচনামূলক চিন্তার দমন... বিংশ শতাব্দীর গল্প এমনই করুণ। এর চেয়েও খারাপ বিষয় হলো পশ্চিমারা অত্যন্ত নিয়মতান্ত্রিকভাবে ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে মুসলিম পরিচয় মুছে দিতে চেয়েছিল... কখনো আরব জাতীয়তাবাদ ব্যবহার করে আবার কখনো ইসলাম পূর্ব মৃত সংস্কৃতিগুলো পুনরায় চালু করে।

পূর্ব থেকেই বিদ্যমান জাতিগত, ভাষাগত বা বর্ণগত উত্তেজনা বাড়িয়ে তোলে পশ্চিমারা। নতুন নতুন দ্বন্দ্ব তৈরি করে। এর উদ্দেশ্য ছিল সাইকস-পিকট চুক্তির মতো নব্য ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা তৈরি করা। মক্কার পশ্চিমে বসবাসকারী জনগণকে চরম দারিদ্রতার মধ্যে ফেলে দেয় পশ্চিমারা। অপরদিকে ইয়েমেন ব্যতীত, আরব উপদ্বীপের অন্য দেশগুলোর জন্য বিলাসবহুল জীবনের দরজা উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। ইরাককে সমূলে ধ্বংস করা হয়। শামকে খণ্ড বিখণ্ড করে শামের কেন্দ্রে মধ্যপ্রাচ্যের বিষফোঁড়া, ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করে।

আরব এবং অনারব মুসলিমদের মাঝে বিস্তর ভাষাগত, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক ব্যবধান তৈরি করা হয়। বিভিন্ন জাতিগত পটভূমি থেকে আসা মুসলিমদের মাঝে একতা ও সহাবস্থানের বোধ বিনষ্ট করে দেওয়া হয়। এর বদলে জায়গা করে নেয় পারস্পরিক শত্রুতা। আতাতুর্কের সহায়তায়, মুসলিম উম্মাহর সাবেক অভিভাবক তুর্কির উসমানী খিলাফত, ধর্মনিরপেক্ষতার দুর্গে পরিণত হয়। মুসলিম দেশগুলোর বিচার বিভাগ

এবং শিক্ষাব্যবস্থা পশ্চিমা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের ভিত্তিতে ঢেলে সাজানো হয়। যার ফলে পশ্চিমাদের অধঃপতিত সংস্কৃতি, জীবনব্যবস্থা মুসলিমদের আদর্শ হয়ে ওঠে। এমন পটভূমিতেই হাজির হয় ৯/১১... পৃথিবী থেকে ইসলামের নাম নিশানা মুছে ফেলা এবং ইসলামি সংস্কৃতি, আদর্শের পরিবর্তে পাশ্চাত্য জীবন ব্যবস্থা চাপিয়ে দেবার যে প্রচেষ্টায় লিপ্ত ছিল পশ্চিমারা- তার সামনে বাঁধা হয়ে। আমরা এখানে প্রযুক্তিগত দিক নিয়ে আলোচনা করছি না। ইউরোপিয়ানদের আগমনের পূর্ব থেকেই মুসলিমরা প্রযুক্তিগত দিক দিয়ে অনেক এগিয়ে ছিল। আমাদের উদ্বেগ হলো মুসলিমদের আদর্শ, মূল্যবোধ ধ্বংসের ব্যাপারে। আমরা আলোচনা করতে চাই পাশ্চাত্যের সেই নিয়মতান্ত্রিক ক্যাম্পেইন নিয়ে যার উদ্দেশ্য মুসলিমদের অপমানিত এক জাতিতে পরিণত করা। এমন মুসলিম তৈরি করা, যারা কোনো কিছু না বুঝে অন্ধভাবে পাশ্চাত্যকে অনুসরণ করবে। আমাদের বিবেচিত বিষয় হলো ইসলামের প্রতি পাশ্চাত্যের শত্রুতা। ইসলামের বিরুদ্ধে পাশ্চাত্যের পরিচালিত যুদ্ধ। এবং এই ধর্মের সমস্ত চিহ্ন মুছে ফেলার প্রচেষ্টা। ভয়াবহ আকারে পাশ্চাত্যের অনৈতিক, বিকৃত চিন্তা ভাবনা ছড়িয়ে পড়া আমাদের উদ্বিগ্ন করে।

ইতিহাস জুড়েই, বেশ কয়েকটি সাম্রাজ্য বিশ্বের বিশাল বিশাল অঞ্চল পরিচালনা করার চেষ্টা

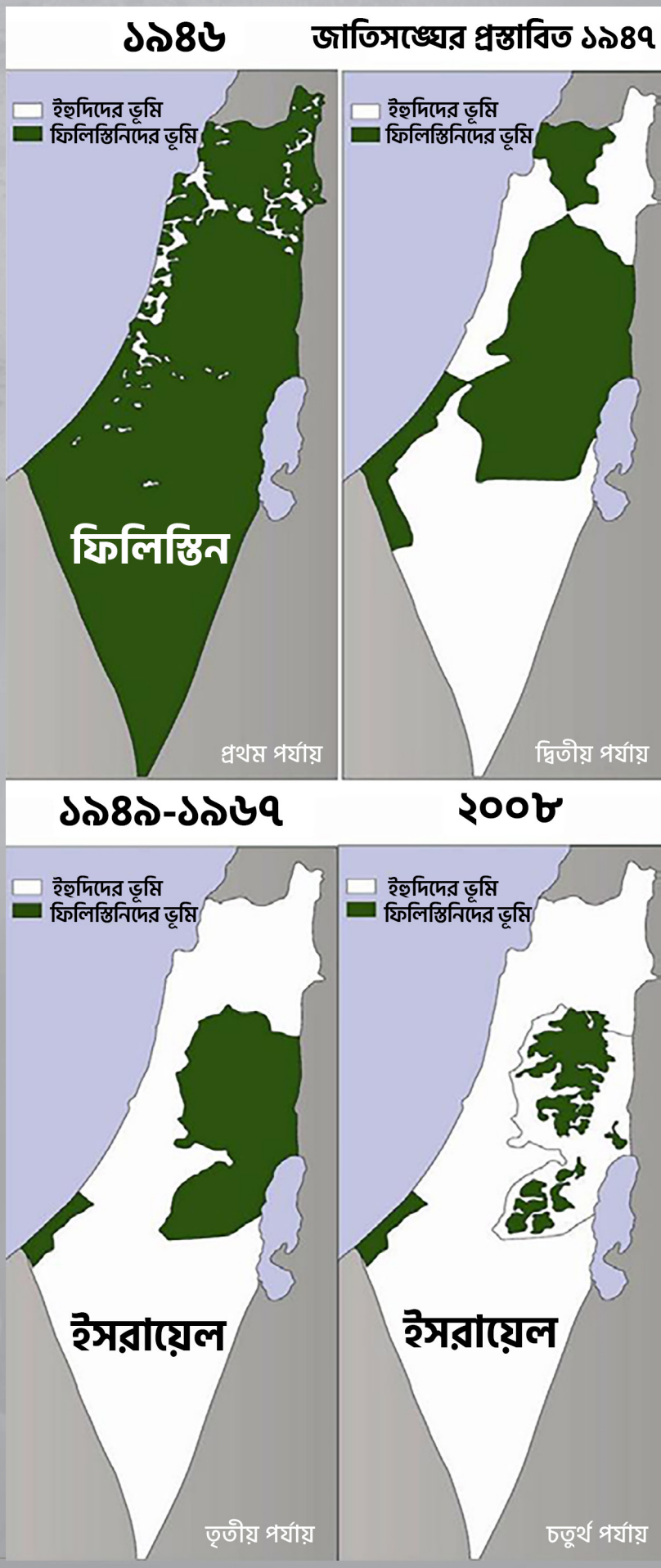

করেছে। প্রত্যেকেই কিছু না কিছু প্রাতিষ্ঠানিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক প্রভাব রেখে গেছে। তবে কেবল একটি জাতিই খুব গভীর প্রভাব রেখেছে পুরো বিশ্ব এবং বিশ্বের মানুষদের উপর। কারণ এই মুসলিম জাতি অন্য জাতিগুলোর মতো না। এই জাতির প্রধান বিবেচ্য বিষয়-মানুষ। এদের পূর্বে বা পরে যারা ছিল, তাদের চিন্তা 'মানুষ' নিয়ে ছিল না। বরং তাদের চিন্তা ছিল কীভাবে মানুষদের দাস বানানো যায় বা ধ্বংস করা যায়।

ইসলাম প্রতিষ্ঠা করেছিল একটি আন্তর্জাতিক পরিচয় – উম্মাহ। এটি পৃথিবীকে উপহার দিয়েছিল একটি সুন্দর সভ্যতা, মূল্যবোধ, আদর্শ, নীতি, নিয়ম-কানুন, প্রথা, ঐতিহ্য। এর ভিত্তিতে মানুষ অগ্রগতি সাধন করেছিল। এই ঐশ্বরিক নির্দেশনার অধীনে মানবজাতি নতুন উচ্চতায় আরোহণ করেছিল। খুঁজে পেয়েছিল চিরন্তন মুক্তির উপায়। এভাবেই মুসলিম উম্মাহর উদয় হয়। এবং এভাবেই আবার বিশ্বকে নেতৃত্ব দিতে এটি ফিরে আসবে। ১১ই সেপ্টেম্বর মূলত ছিল একটি জাতির প্রতিরোধের বহিঃপ্রকাশ। নতুন ভবিষ্যৎ গড়ার জন্য যে জাতি আবার উঠে দাঁড়িয়েছে।

শেষ করার পূর্বে, পশ্চিমা সংস্কৃতির মশালবাহীদের আমরা বলতে চাই "যারা চায় যে, মুমিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রচার ঘটুক তাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জানো না।"

তাহলে কেন বিশ্বের অসংখ্য লোক 'আমেরিকান ড্রিমের' মিথ্যে মোহে আচ্ছন্ন? এই প্রশ্নের উত্তর হলো -মার্কিন মিডিয়া মেশিন.... হলিউড, মুভি, প্রিন্ট মিডিয়া। এগুলো পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ধোঁকাবাজির যন্ত্র। এগুলোর মাধ্যমে বিশ্ববাসীর মগজধোলাই করে আমেরিকা। আমরা যে পৃথিবীতে বাস করছি সেখানে মানবাধিকার, নির্বাচন, বা গণতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের কাঠামো ইত্যাদির মতো ধারণাগুলো একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক। এদের কিছুই করার নেই এই বিশ্ব ব্যবস্থায়। যারা আমাদের নিয়ন্ত্রণ করে সবকিছুই তাদের ইচ্ছাধীন।

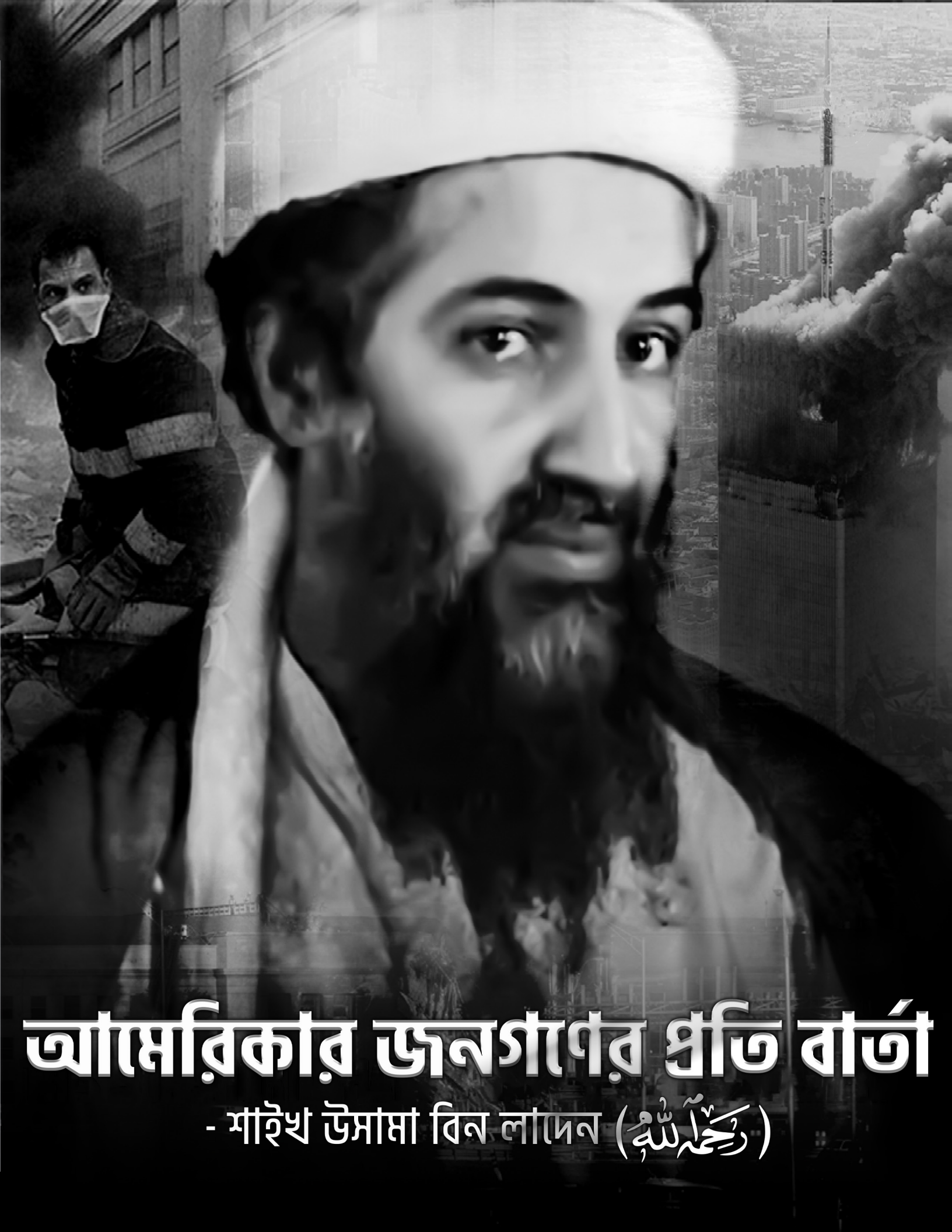

আমেরিকার জনগণের প্রতি বার্তা

- শাইখ উসামা বিন লাদেন (رحمه الله)

হে আমেরিকার জনগণ!

সত্যপথের অনুসারীদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক।

আমার এই বার্তার বিষয়গুলোর অনুধাবন, আরেকটি ম্যানহাটন হামলা এড়ানোর সম্ভাব্য সর্বোত্তম উপায়। এই বার্তায় চলমান যুদ্ধ, যুদ্ধের কারণ এবং এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

শুরুতেই, আমি বলতে চাই: 'শান্তি' মানব জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। জর্জ বুশ দাবি করছে যে, আমরা স্বাধীনতা পছন্দ করি না।[1] তার বিপরীতে আমি বলতে চাই, স্বাধীন ব্যক্তিরা কখনোই তাদের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে কোনো আপোষ করে না। যদি বুশের দাবি সত্যি হয় তবে সে ব্যাখ্যা করুক - কেন আমরা সুইডেনের মতো দেশে আঘাত করি না[2]? যারা স্বাধীনতা ঘৃণা করে তারা কখনই আমেরিকাতে আক্রমণকারী সেই ১৯ জন যুবকের মতো প্রতিবাদী সত্তার অধিকারী হতে পারবে না।

> **এই বার্তার বিষয়গুলোর অনুধাবন, আরেকটি ম্যানহাটন হামলা এড়ানোর সম্ভাব্য সর্বোত্তম উপায়।**

আমরা তোমাদের সাথে লড়াই করি কারণ আমরা স্বাধীন মানুষ; আমরা নিপীড়ন মেনে নিতে পারি না। আমরা চাই আমাদের জাতির কাছে আবার স্বাধীনতা ফিরে আসুক। তোমরা যেমন আমাদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করেছ ঠিক তেমনি আমরাও তোমাদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করব। কেবল একজন নির্বোধ ডাকাত অন্যের সুরক্ষা বিঘ্নিত করার পরও আশা করবে যে তার নিজের সুরক্ষা নিশ্চিত থাকবে। বুদ্ধিমান লোকেরা বিপর্যস্ত হলে, ঘটনার অন্তর্নিহিত কারণগুলো গুরুত্বের সাথে পর্যালোচনা করে। যেন এর পুনরাবৃত্তি না ঘটে। তবে, তোমাদের আচরণ আমাকে বিস্মিত করে! ৯/১১-এর ৪ বছর পরেও বুশ এই ঘটনাগুলোর আসল কারণ গোপন করার জন্য কৌশলে তোমাদের বিভ্রান্ত করে মনোযোগ অন্যদিকে সরিয়ে রাখছে।

এর ফলে যে কারণগুলোর জন্য ৯/১১ হামলা চালানো হয়েছিল এবং প্রয়োজনে আবারও হামলা করা হতে পারে – সে কারণগুলো অপরিবর্তিত থেকে যাচ্ছে। আমি এখানে এই হামলার পিছনের কারণগুলো তোমাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করব। প্রকৃতপক্ষে, কোন পরিপ্রেক্ষিতে এই হামলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল সেটি তোমাদের সামনে আজ তুলে ধরব।

কখনও ভাবিনি যে, আমরা একদিন টুইন টাওয়ারে আঘাত করব। আমেরিকা-ইসরাইল জোটের চালানো অত্যাচার ও নিপীড়ন যখন সকল সীমা অতিক্রম করে তখন এই বিষয়টি সর্বপ্রথম আমার মাথায় আসে। ফিলিস্তিন এবং লেবাননে[3] আমাদের জনগণের উপর আমেরিকা-ইসরাইল জোটের অবর্ণনীয় নিপীড়ন আমরা দেখেছি। সেই সময়টাতে আমি তীব্র মনঃকষ্টে ছিলাম যা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। যাইহোক, এই ঘটনা আমার মধ্যে প্রতিরোধের মানসিকতা গড়ে তোলে। অত্যাচারীদের শাস্তি দেওয়ার জন্য দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হই আমি।

লেবাননের বিধ্বস্ত এপার্টমেন্টগুলো দেখার পর আমার মাথায় আসল যে, লেবাননে তোমাদের

1 ২০০১ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর আমেরিকার তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ ফ্রান্সের প্রেসিডেন্টের সাথে একটি অনুষ্ঠানে বলেছিল – "আমরা একটি নতুন ধরনের যুদ্ধে নেমেছি। আমরা এমন একদল মানুষের সাথে যুদ্ধ করছি যারা স্বাধীনতা পছন্দ করে না"।

2 শাইখ এখানে বুঝিয়েছেন – যেহেতু সুইডেন এই মুহূর্তে (২০০৪ সালে) মুসলিমদের উপর আক্রমণ করছে না তাই আমরাও তাদের উপর আক্রমণ করছি না।

3 ১৯৮২ সালের ৬ ই জুন, ইসরাইল লেবাননের উপর হামলা চালায়। এই অপারেশনের নাম ছিল 'অপারেশন পিস ফর গেলিলি'। এই হামলায় বৈরুতে প্রায় ২০,০০০ লোক মারা যায়।

প্রয়োগ করা পদ্ধতি ব্যবহার করে তোমাদেরকে এর তিক্ততার স্বাদ আস্বাদন করাতে হবে। আর এজন্য সবচেয়ে উৎকৃষ্ট উপায় হলো আমেরিকার টাওয়ারগুলো ধ্বংস করা। যেন তোমরাও আমাদের মতো ধ্বংসের তিক্ততার স্বাদ অনুভব করতে সক্ষম হও। সম্ভবত, এটি তোমাদেরকে আমাদের নিরপরাধ নারী ও শিশুদের হত্যা করা থেকে বিরত রাখবে। সেদিনই আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে, আমেরিকা নিজ স্বার্থেই আপোষে নারী এবং শিশুদের হত্যা করাকে ন্যায়সঙ্গত মনে করে।

> আমেরিকার যেসকল রাজ্য আমাদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে না, আমাদের দ্বারা তাদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে না ইনশা আল্লাহ।

আমেরিকার সেইসকল জঘন্য অন্যায়ের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ ৯/১১ হামলা চালানো হয়েছিল। এখন তোমাদের কাছে আমার জিজ্ঞাসা, নিজ জন্মভূমি রক্ষার চেষ্টা করলে তাকে কি অপরাধী বলা যাবে? আত্মরক্ষা এবং অত্যাচারীর অত্যাচারের প্রতিক্রিয়াকে কি সন্ত্রাসী কার্যক্রম বলা যাবে? যদি এটাকে সন্ত্রাসী কার্যক্রম বলা হয়, তবে আমাদের নিকট এই সন্ত্রাসী কার্যক্রম গ্রহণ করা ছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই।

এই বিষয়টিই আমরা ৯/১১ এর বহু বছর পূর্ব থেকে কথা এবং কাজের মাধ্যমে তোমাদের জানাতে আগ্রহী ছিলাম। তোমরা দেখতে পাবে - ১৯৯৬ সালের টাইম ম্যাগাজিনের সাক্ষাৎকারে, ১৯৯৭ সালে সিএনএন এর পিটার আরনেটের সাক্ষাৎকারে এবং ১৯৯৯ সালে জন উইনার এর সাক্ষাৎকারে -আমি এবিষয়টি স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেছি। তোমরা যদি আরও সহজ, আরও বাস্তবিক বার্তা চাও তবে নাইরোবি, তানজানিয়া এবং এডেনের ঘটনাগুলোতে এর প্রমাণ দেখতে পাবে। আবদুল বারী আল আতওয়ান এবং রবার্ট ফিস্কের সাথে আমার সাক্ষাৎকারগুলো দেখলেও বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে ইনশা আল্লাহ।

তোমাদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি - আমরা ৯/১১ হামলার দলনেতা মুহাম্মাদ আত্তা রহিমাহুল্লাহ'র সাথে এব্যাপারে একমত হয়েছিলাম যে, পুরো অভিযানটি আমরা ২০ মিনিটের মধ্যে শেষ করব যেন বুশ প্রশাসন কোনো প্রতিক্রিয়া দেখানোর সুযোগ না পায়।

আমাদের কল্পনাতেও আসেনি যে, আমেরিকার সশস্ত্র বাহিনীর কমান্ডার-ইন-চিফ বিধ্বস্ত টুইন টাওয়ারে ৫০ হাজার আমেরিকানকে অসহায় অবস্থায় ছেড়ে দিবে যখন তাদের, তার সহায়তার একান্ত প্রয়োজন ছিল। সম্ভবত, বাচ্চাদেরকে ছাগল পালন সংক্রান্ত বই পড়ানো[4] তার কাছে ৫০ হাজার আমেরিকানের জীবনের চাইতে অধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছিল। তাই অপারেশন সমাপ্তির জন্য যে সময় বরাদ্দ করা হয়েছিল তার তিনগুণ সময় আমরা পেয়েছিলাম।

শেষ করার পূর্বে, আমি তোমাদের সততার সাথে একটি কথা বলতে চাই- তোমাদের নিরাপত্তা বুশ, কেরি বা আল-কায়েদার হাতে নেই। তোমাদের নিরাপত্তা তোমাদের নিজেদের হাতে। আমেরিকার যেসকল রাজ্য আমাদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে না, আমাদের দ্বারা তাদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে না ইনশা আল্লাহ। আমাদের রক্ষাকারী হলেন আল্লাহ, আর তোমাদের কোনো রক্ষাকারী নেই। আর যারা সৎপথ অনুসরণ করে তাঁদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক।

4 ৯/১১ এর সকালে ফ্লোরিডার একটি স্কুলে বুশের The Pet Goat নামক একটি বই পড়ানোর প্রোগ্রাম ছিল। ৯ টা ২ মিনিটে সে প্রথম বিমান হামলার কথা জানতে পারে। এরপর সে ক্লাসে প্রবেশ করে ও ৯:১৬ পর্যন্ত পড়ায়। ৯:২৯ এ একটি বক্তৃতা দেয়। এরপর ৯:৩৩ এ স্কুল থেকে বের হয়ে এয়ারপোর্টের দিকে রওনা দেয়।

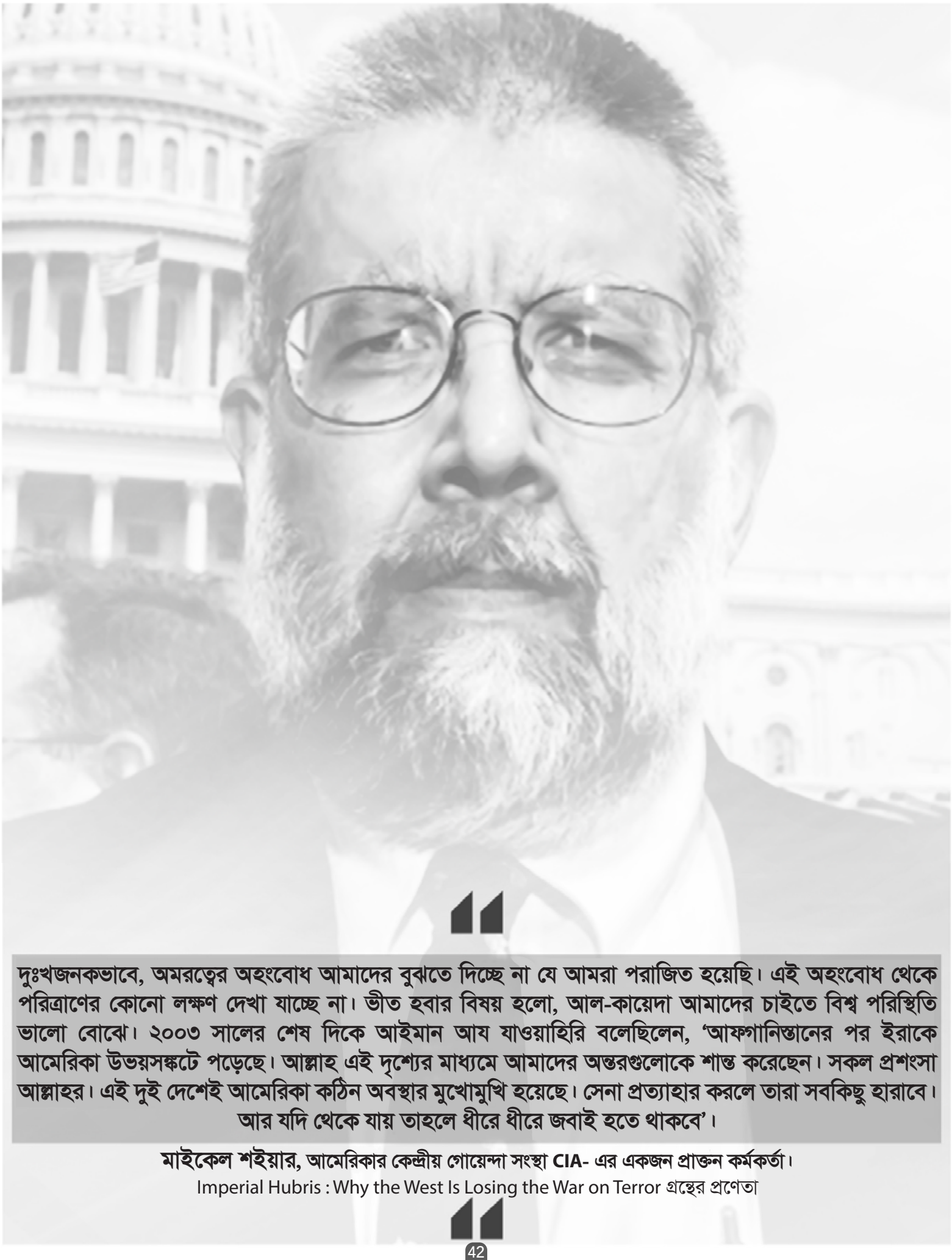

দুঃখজনকভাবে, অমরত্বের অহংবোধ আমাদের বুঝতে দিচ্ছে না যে আমরা পরাজিত হয়েছি। এই অহংবোধ থেকে পরিত্রাণের কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। ভীত হবার বিষয় হলো, আল-কায়েদা আমাদের চাইতে বিশ্ব পরিস্থিতি ভালো বোঝে। ২০০৩ সালের শেষ দিকে আইমান আয যাওয়াহিরি বলেছিলেন, 'আফগানিস্তানের পর ইরাকে আমেরিকা উভয়সঙ্কটে পড়েছে। আল্লাহ এই দৃশ্যের মাধ্যমে আমাদের অন্তরগুলোকে শান্ত করেছেন। সকল প্রশংসা আল্লাহর। এই দুই দেশেই আমেরিকা কঠিন অবস্থার মুখোমুখি হয়েছে। সেনা প্রত্যাহার করলে তারা সবকিছু হারাবে। আর যদি থেকে যায় তাহলে ধীরে ধীরে জবাই হতে থাকবে'।

মাইকেল শইয়ার, আমেরিকার কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা **CIA-** এর একজন প্রাক্তন কর্মকর্তা।
Imperial Hubris : Why the West Is Losing the War on Terror গ্রন্থের প্রণেতা

৯/১১ হামলার বীর মুজাহিদ || শাহাদত পিয়াসী

আবুল আব্বাস আল জানুবি

(আল্লাহ তাঁকে কবুল করুন)

সম্মানিত শাইখ, আল্লাহর পথের দাঈ এবং যোদ্ধা আব্দুল আজিজ বিন আব্দুর রহমান বিন মুহাম্মাদ আল উমারি আয যাহরানি, আবু আল আব্বাস আল জানুবি নামে সমাধিক পরিচিত ছিলেন। তিনি ছিলেন মুহাম্মাদ আতা রহিমাহুল্লাহ'র নেতৃত্বে আমেরিকার বাণিজ্যকেন্দ্র ধ্বংসকারী দলের একজন সদস্য। তাঁর সম্পর্কে শাইখ উসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহ বলেন, "সমসাময়িক আলেমগণের মধ্যে অনুসরণীয় এক ব্যক্তিত্ব তিনি। তিনি ছিলেন সালাফদের প্রকৃত উত্তরসূরি যিনি তাঁর ইলমকে আমলে রূপান্তরিত করতে অধিক সচেষ্ট ছিলেন"।

সৌদি আরবের 'বাহা' অঞ্চলের 'মাখওয়াত' জেলার 'ওয়াদি হোরান' গ্রামে তাঁর জন্ম। সম্ভ্রান্ত এক পরিবারে তিনি বেড়ে উঠেন। তাঁর পিতা ছিলেন 'বাহা'-র অন্যতম একজন আলেম এবং দাঈ যিনি 'মাখওয়াত' মসজিদে ফিকহের দারস প্রদান করতেন। সন্তানকে ইসলামের দীক্ষায় দীক্ষিত করতে তিনি চেষ্টার কোনো ত্রুটি করেননি। শৈশবে পিতার নিকট কুরআন হিফজের মাধ্যমে শাইখ আবু আব্বাস আল জানুবির ইলমের পথে যাত্রা শুরু হয়। অতঃপর ইলম অর্জনের উদ্দেশ্যে 'ইমাম মুহাম্মাদ বিন আল সৌদ' বিশ্ববিদ্যালয়ের 'শরীয়াহ' বিভাগে ভর্তি হন। মেধার স্বাক্ষর রেখে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। এরপর 'কাসিম' ও 'নজদের' কয়েকজন শায়েখের নিকট থেকে ঈলম অর্জন করেন।

> **"বরং আমি আল্লাহর জন্য নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছি এমন এক সময়ে যখন আমি যৌবনের শীর্ষ চূড়ায়, যখন আমি খাবারের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম খাবার খাচ্ছিলাম আর যখন আমি পানীয়ের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম পানীয় পান করছিলাম!**

তাঁর শিক্ষকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন- কারাবন্দী শাইখ সুলাইমান আল উলওয়ান, সা'দ গুনায়মান, শামসান, মুশাইকাহান্দ প্রভৃতি। শাইখ আবু আব্বাস আল জানুবি 'আল আনিযার' কেন্দ্রীয় মসজিদের ইমাম শাইখ ইবনে উসাইমিনের সর্বাধিক প্রখ্যাত ছাত্র ছিলেন। তিনি শাইখ উসাইমিনের নিকট বুলুগুল মা'রামসহ ইবনে হাজারের অন্যান্য গ্রন্থের ইলম শিক্ষা লাভ করেন।

শাইখ আবুল আব্বাস আল জানুবির অন্তর ছিল কুরআন এবং সুন্নাহর প্রতি অনিঃশেষ ভালোবাসায় পরিপূর্ণ। ইলম সাগর থেকে স্বচ্ছ-পরিপূর্ণ সত্য ইলম তিনি আহরণ করেছেন। বর্ণনাসূত্রসহ বুখারি, মুসলিম, বুলুগুল মারাম, উমদাত আল আহকাম ইত্যাদি গ্রন্থ মুখস্থ করেছেন। সমসাময়িক শীর্ষস্থানীয় আলেমদের নিকট থেকে এসব হাদীসের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সম্পর্কেও শিক্ষালাভ করেন। রমাদানে তারাবীহ সলাতের ইমামতি করতেও দেখা যেত তাঁকে।

পুণ্যবতী একজন স্ত্রী দ্বারা আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা তাঁর চোখ শীতল করেছেন এবং কন্যা সন্তান দ্বারা রহম করেছেন। সুন্নাহর অনুসরণ এবং পিতামাতার প্রতি কর্তব্য পালনে তিনি ছিলেন অত্যন্ত যত্নবান। তিনি ছিলেন তাক্বওয়াবান, শান্ত স্বভাবের অধিকারী। ধনী পরিবারের সন্তান হয়েও ঐশ্বর্যপূর্ণ জীবনকে ছুঁড়ে ফেলে, বেছে নিয়েছিলেন অনাড়ম্বরপূর্ণ যুহুদের

জীবন। নিজের শেষ বক্তব্যে তিনি (শহীদ ইনশা আল্লাহ) বলেন,

“আমি এই পথ বেছে নিয়েছি, কারণ আমি এ বিশ্বাস করি এটি নববী বিশুদ্ধ মানহাজ এবং সালাফগণের পথ। আমি এপথ বেছে নিয়েছি কেবল আখিরাতে উত্তম প্রতিদানের আশায়। আমি বিশ্বাস করি এই উম্মাহর জন্য আমার ঘাড়ে কিছু দায়িত্ব কর্তব্য অর্পিত হয়েছে। এবং সেই কর্তব্য পূরণের লক্ষ্যেই আমি পা বাড়াচ্ছি। আমার যাত্রা উম্মাহর মাঝে জিহাদ পুনর্জাগরণের পথে। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি একমাত্র জিহাদ’ই সে পথ, যে পথে রয়েছে উম্মাহর মুক্তি।

> **“কেবল এ পথেই ফিরিয়ে আনা যাবে মুসলিম উম্মাহর হারানো গৌরব। আজ হোক কাল হোক, এই পবিত্র আরব উপদ্বীপ থেকে প্রতিটি কাফেরকে উচ্ছেদ করা হবে ইনশা আল্লাহ। চুপ থেকে কিংবা গর্জন করে নয় কেবল আল্লাহর পথে জিহাদের মাধ্যমেই তা হবে ইনশা আল্লাহ।**

মুসলিম উম্মাহর লাঞ্ছিত অবস্থা থেকে উত্তরণ এবং দখলকৃত ভূমি ফিরিয়ে আনার একমাত্র পথ, জিহাদ।

আমি আল্লাহর জন্য জীবন বিলিয়ে দিতে যাচ্ছি। বিষয়টি এমন নয় যে জাহেলিয়াতের জীবন থেকে পালানোর জন্য কিংবা আর দশজনের মতো জীবন উপভোগ করতে পারছি না, সেজন্য আমি জীবন বিলিয়ে দিচ্ছি। ওয়াল্লাহি! এমন কিছুই না। বরং আমি আল্লাহর জন্য নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছি এমন এক সময়ে যখন আমি যৌবনের শীর্ষ চূড়ায়, যখন আমি খাবারের মধ্যে সবচে উত্তম খাবার খাচ্ছিলাম আর যখন আমি পানীয়ের মধ্যে সবচে উত্তম পানীয় পান করছিলাম!

আমার ছিল অনিন্দ্য সুন্দর বিলাসবহুল বাড়ি, দামী গাড়ি। আমাকে হাতছানি দিচ্ছিল মোটা বেতনের চাকরি। কিন্ত বার বার আমাকে তাড়া করছিল একটি প্রশ্ন, “এরপর? এরপর কী?” কীভাবে আমি আমার কাঁধে অর্পিত দায়িত্ব পালন করে প্রশান্তির জীবন যাপন করতে পারি- এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম আমি। দৃঢ় কণ্ঠে তাই আজ আপনাদের বলছি, ‘আমাদের অবশ্যই লড়তে হবে। লড়তে হবে আমেরিকা এবং এর পা চাটা দালালদের বিরুদ্ধে। যুগের হুবাল আমেরিকার নাক ধুলোয় ধূসরিত করে বিশ্বকে দেখিয়ে দিতে হবে এর দুর্বলতা। এ পথে... কেবল এ পথেই ফিরিয়ে আনা যাবে মুসলিম উম্মাহর হারানো গৌরব। আজ হোক কাল হোক, এই পবিত্র আরব উপদ্বীপ থেকে প্রতিটি কাফেরকে উচ্ছেদ করা হবে ইনশা আল্লাহ। চুপ থেকে কিংবা গর্জন করে নয় কেবল আল্লাহর পথে জিহাদের মাধ্যমেই তা হবে ইনশা আল্লাহ।

হে প্রিয় ভাই আমার! হে ভাই আমার!

তোমার জান, মাল এবং সন্তান-সন্তাদি বিলিয়ে দাও আল্লাহর জন্য। আর যদি এতে তুমি অক্ষম হও তবে অন্যদের উদ্বুদ্ধ করো, জিহাদের পক্ষে আওয়াজ তোলো। আর যদি এতেও তুমি অক্ষম হও, তবে অন্তত তোমার দু’আই মুজাহিদদের স্মরণ করো”।

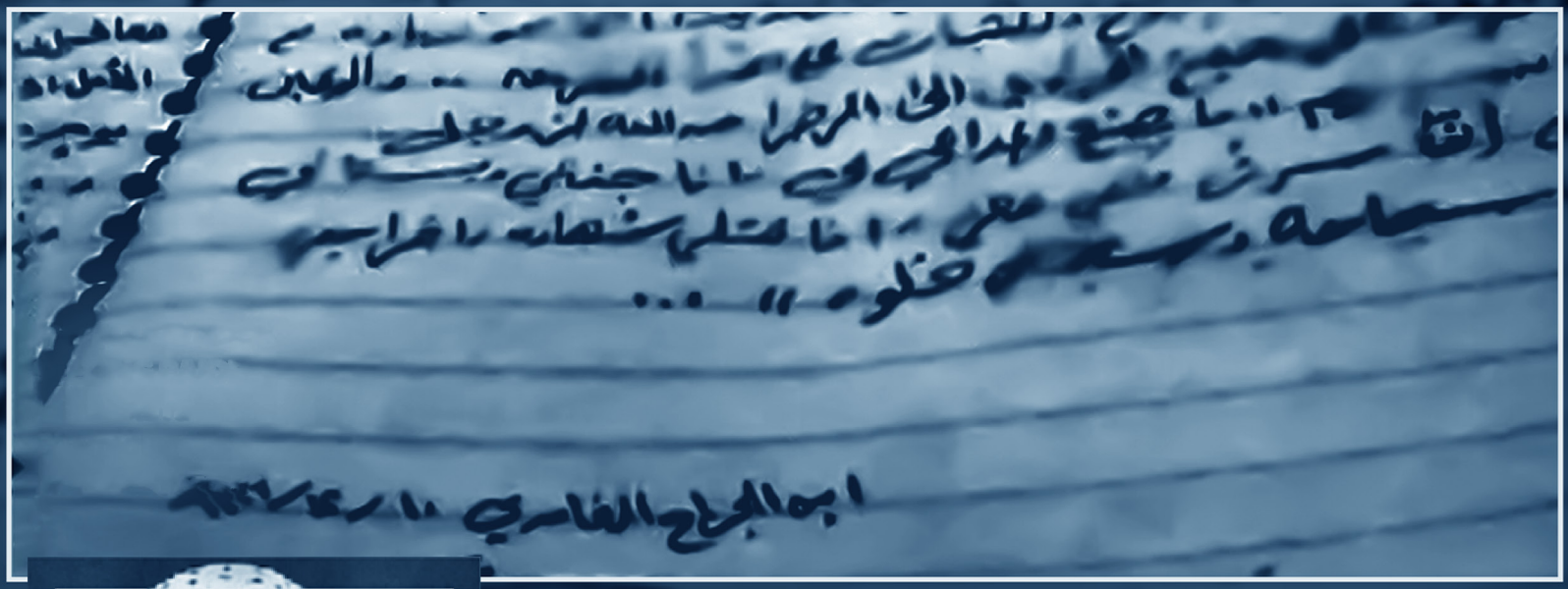

৯/১১ হামলার বীর মুজাহিদ শাহাদত পিয়াসী

ইবনুল জাররাহ আল গামিদি

(আল্লাহ তাঁকে কবুল করুন!)

মুজাহিদ শাইখ ইবনুল জাররাহ আল গামিদিরপুরো নাম আহমাদ বিন ইবরাহীম বিন আলি বিন মুসলিম আল হাযনাবি আল গামিদি আল আজদি। তিনি একাধারে অসাধারণ বক্তা, কবি এবং লেখক। তিনি সৌদি আরবের 'বাহা' অঞ্চলের 'বালজারশি' এলাকার 'হাযনা' গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। সম্ভ্রান্ত, ধার্মিক এক পরিবারে তাঁর বেড়ে উঠা। পিতা শাইখ ইবরাহীম বিন মুসলিম আল হাযনাবি রহিমাহুমুল্লাহ'র সর্বকনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন তিনি। আর শাইখ ইবরাহীম আল হাযনাবি হলেন শাইখ ইবনে বায রহিমাহুল্লাহ এবং শাইখ মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম আ'ল শাইখ রহিমাহুমুল্লাহ'র ছাত্র। বিখ্যাত বালজারশি মসজিদের ইমাম এবং অত্র অঞ্চলের বিজ্ঞ আলেম ও দাঈ হিসেবে শাইখ ইবরাহীম সুপরিচিত ছিলেন ।

তারুণ্যের শুরুতেই ইবনুল জাররাহ আল গামিদি আগ্রাসী রাশিয়ার বিরুদ্ধে আফগান জিহাদের সাথে যুক্ত হয়ে পড়েন। শাইখ আযযামকে (আল্লাহ তাঁকে রহম করুন) তিনি অত্যন্ত ভালোবাসতেন। শাইখের

বক্তব্য কিংবা লেখনীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল অবিচ্ছিন্ন; শাইখের সান্নিধ্য ব্যতীত যেন তার একটি দিনও কাটত না। বর্তমান মুসলিম উম্মাহ বিশেষত ফিলিস্তিনের ভাইদের জন্য তাঁর হৃদয়ে অনবরত রক্তক্ষরণ হতো।

তাওহীদ, ঈমান এবং কুরআনময় এক পরিবেশে তাঁর বেড়ে উঠা। তাঁর ফিতরাত ছিলো অত্যন্ত বিশুদ্ধ। ঘৃণা, বিদ্বেষ, কুসংস্কার ইত্যাদির কোনো স্থান ছিলো না তাঁর অন্তরে। তিনি ছিলেন শান্ত, স্বল্পভাষী, ধৈর্যশীল, ক্ষমাশীল, ন্যায়পরায়ণ, দয়ালু। এক চিলতে মুচকি হাসি লেগেই থাকত মুখে। তাঁর অন্তরের প্রাচুর্য ছিল কুরআন, সুন্নাহ এবং সীরাহ। সিংহের ন্যায় পুরুষত্ব, বীরত্ব এবং সাহসিকতাকে তিনি ভালোবাসতেন; নিজের ব্যক্তিত্বে এ গুণগুলো ধারণের চেষ্টা করতেন। আর তাই জিহাদের প্রস্তুতির জন্য তাঁকে দেখা যেত হাযনা পর্বতে। ময়দানে আসার পূর্ব থেকেই, তিনি পাহাড়ে আরোহণ করতেন এবং সেখানে শরীর চর্চার মাধ্যমে নিজেকে প্রস্তুত করতেন।

“তাওহীদ, ঈমান এবং কুরআনময় এক পরিবেশে তাঁর বেড়ে উঠা। তাঁর ফিতরাত ছিলো অত্যন্ত বিশুদ্ধ। ঘৃণা, বিদ্বেষ, কুসংস্কার ইত্যাদির কোনো স্থান ছিলো না তাঁর অন্তরে। তিনি ছিলেন শান্ত, স্বল্পভাষী, ধৈর্যশীল, ক্ষমাশীল, ন্যায়পরায়ণ, দয়ালু। এক চিলতে মুচকি হাসি লেগেই থাকত মুখে। তাঁর অন্তরের প্রাচুর্য ছিল কুরআন, সুন্নাহ এবং সীরাহ। সিংহের ন্যায় পুরুষত্ব, বীরত্ব এবং সাহসিকতাকে তিনি ভালোবাসতেন; নিজের ব্যক্তিত্বে এ গুণগুলো ধারণের চেষ্টা করতেন।

ইলমের প্রতি ছিল তাঁর গভীর অনুরাগ। পিতা কিংবা অন্যান্য আলেমগণের যেকোনো দারসের যেন আবশ্যিক বৈশিষ্ট্য ছিল তাঁর উপস্থিতি। নিজে ঈলম চর্চার পাশাপাশি গ্রীষ্মকালীন ক্যাম্পগুলোতে বা ক্লাবগুলোতে যুবকদের উদ্দেশ্য বক্তৃতা করতেন। উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে ১৪১৭ হিজরি সনে ‘উম্মুল কুরা’ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রকৌশল বিভাগে ভর্তি হন তিনি। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি ধর্মীয় জ্ঞান অর্জনেও সক্রিয় ছিলেন। ১৪২০ হিজরি সনে, জিহাদের পথে অগ্রসর হন। অন্যান্য ভাইদের সাথে আফগানিস্তানের কান্দাহার প্রদেশের মাইওয়ান্দে ‘আল-ফারুক’ প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে যোগদান করেন। সেখানে সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে ফ্রন্টলাইনের বেশকিছু অভিযানে অংশগ্রহণ করেন।

বীরত্ব, উপস্থিত বুদ্ধি এবং সূক্ষ্ম কৌশলের কারণে সঙ্গী মুজাহিদদের নিকট তিনি ছিলেন অত্যন্ত প্রিয়। আর একই কারণে শাইখ উসামা বিন লাদেন আমেরিকায় হামলার জন্য তাঁকে বেছে নেন।

শহীদ (ইনশা আল্লাহ) ইবনুল জাররাহ আল গামিদি তাঁর সর্বশেষ ওসীয়তে ব্যক্ত করেন,

ওয়াল্লাহি! আমি অন্যদের ন্যায় অপমানের জীবন গ্রহণ করিনি। আমার আত্মা তার রবের ধর্ম প্রতিষ্ঠা ব্যতীত জীবনের স্বাদ গ্রহণ করতে সম্মত হয়নি। এজন্য প্রিয়জনদের ছেড়ে হিজরত করতেও আমি কখনো দ্বিধাবোধ করিনি। ময়দান তো সিংহদেরই জন্য, আর জান্নাত তো জান্নাতপ্রত্যাশী সিংহদের আহ্বান জানাচ্ছে। আর তাই আমি আল্লাহর দুশমনদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নেমেছি। আজ আমি লড়তে যাচ্ছি আল্লাহর দুশমন আমেরিকার বিরুদ্ধে, আমেরিকার মাটিতেই। আমি শাহাদাত কামনা করি আর তা পাওয়ার জন্য লড়াই করছি। আমি গর্বিত, আমি আমার ধর্মের জন্য লড়াই করছি। একারণেই আমি ঘর থেকে বের হয়েছিলাম। আমি এমন ভূমির সন্ধান করছিলাম যেখানে জিহাদের প্রস্তুতি নিতে পারব। আল্লাহর দ্বীনকে সাহায্য করার অংশ হিসেবে আমার ভাইদের রক্তের বদলা নেওয়া, আমেরিকা এবং ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই করার আশা বুকে নিয়ে আমি নিজেকে জিহাদের জন্য প্রস্তুত করতে পারব।

আমেরিকার জনগণের প্রতি আমার বার্তা

‘ইনশা আল্লাহ তোমাদের বিরুদ্ধে আমাদের এই যুদ্ধ চলমান থাকবে। আমেরিকা এবং অন্যান্য স্থানে আমাদের শহীদি অপারেশন চলমান থাকবে, যতক্ষণ না তোমরা জুলুম বন্ধ করো। বোকামি করা বন্ধ করে তোমাদের অপরিপক্ক নেতাদের সাগরে ছুঁড়ে ফেলো। জেনে রাখো, আমরা নিহত ভাইবোনদের ভুলিনি। বিশেষ করে ফিলিস্তিনে তোমাদের মিত্র ইসরায়েলের হাতে যাদের রক্ত ঝরেছে তাঁদের কথা। আল্লাহ্, তাঁদের উপর রহম করুন। ইনশা আল্লাহ্ নিউইয়র্কের দিনের মতো দিনগুলোতে আমরা তোমাদের রক্ত ঝরিয়ে তাঁদের রক্তের বদলা নিব। তোমাদের এবং আমাদের পারস্পরিক নিরাপত্তা নিয়ে আমার বলা কথাগুলো ভুলে যেও না’।

আমীরুল মুজাহিদিন, শাইখ
উসামা বিন লাদেন
(رحمه الله)

৯/১১

এর কিছু সুদূরপ্রসারী ফলাফল

■ আবু আবদুল্লাহ আস-সুদানি

সম্ভবত, ৯/১১ এর হামলা এখন পর্যন্ত শতাব্দীর সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। এবং হতে পারে শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত এটিই সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হিসেবে তার স্থান ধরে রাখবে। আমেরিকার মাটিতে এই দুর্দান্ত হামলাটির পেছনে নানাবিধ কারণ রয়েছে এবং এর প্রভাবও সুদূরপ্রসারী। ৯/১১ এর হামলা ছিল এধরনের প্রথম আক্রমণ, তবে আল্লাহ চাইলে, এটিই শেষ নয়। এই বরকতময় হামলা আমেরিকার অহংকার ও দাম্ভিকতাকে মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়েছে। যুদ্ধকে আমেরিকার নিজ ভূখণ্ডে স্থানান্তরিত করার মাধ্যমে এই হামলাগুলো আমেরিকার দুর্ভেদ্যতার ধারণাটিকে নষ্ট করে দিয়েছে। সম্ভবত এই হামলার সবচেয়ে গভীরতম প্রভাব পড়েছে আমেরিকার বৈশ্বিক খ্যাতিতে। বাগদাদে, বুশের মুখে জুতা ছুড়ে মারার ঘটনা আমেরিকার অপরাজেয় মূর্তির পতনের উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

বেসামরিক বিমানগুলোকে ধ্বংসস্তূপের অস্ত্রে পরিণত করার এই হামলাটি ছিল প্রচলিত সামরিক চিন্তাধারার উপর আক্রমণ। এই অপ্রচলিত পদ্ধতি ব্যবহার করে আমেরিকার শক্তি ও প্রতিপত্তির প্রতীকগুলো, যেগুলো হলিউড ও মিডিয়ার মাধ্যমে জনসাধারণের মনোজগতকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, তা ধুলোয় মিশিয়ে দেওয়া হয়। আল-কায়েদা অত্যন্ত চতুরতার সাথে অপারেশনের সম্পূর্ণ ব্যয়ভার চাপিয়ে দেয় শত্রুর ঘাড়ে। এটি আল-কায়েদার এক অতুলনীয় কৃতিত্ব। আমেরিকার বিমান, আমেরিকার জ্বালানি এবং আমেরিকার বিমানবন্দরগুলো ব্যবহার করেই আমেরিকার একেবারে গভীরে অবস্থিত টার্গেটগুলোর উপর হামলা করা হয়। আঘাত হানা হয় মার্কিন সাম্রাজ্যের সবচেয়ে শক্তিশালী প্রতীকগুলোতে- ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার (অর্থনৈতিক শক্তি), পেন্টাগন (সামরিক শক্তি) এবং কংগ্রেস (রাজনৈতিক জোট/সাম্রাজ্য)।

৯/১১ এর হামলা পরিচালনার জন্য যা ব্যয় করা হয় তার তুলনায় হামলায় ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ছিল অস্বাভাবিকভাবে বেশি।

আমেরিকা এবং যুক্তরাজ্য দুর্ভেদ্যতা, অপরাজেয়তার মিথ তৈরি করে রেখেছিল। এই হামলা সেই মিথকে ভেঙ্গে গুড়িয়ে দেয়। হাজার হাজার মাইল সমুদ্র দ্বারা পরিবেষ্টিত বিচ্ছিন্ন দ্বীপ দুর্গ হিসাবে আমেরিকা দুর্ভেদ্যতার কৌশল সাজিয়ে ছিল। কিন্তু তা অকার্যকর প্রমাণিত হয়। আমেরিকার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এই আকস্মিক আক্রমণে ছারখার হয়ে যায়। বিস্মিত, দাম্ভিক আমেরিকার মান সম্মান ধুলোয় মিশে যায়।

৯/১১ এর সর্বাধিক তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব পড়ে অর্থনীতিতে। হামলার জন্য আল-কায়েদার প্রায় পাঁচ লাখ ডলার খরচ হয়। তবে প্রত্যক্ষ

বা পরোক্ষভাবে আমেরিকার অর্থনৈতিক ক্ষতি ৩.৩ ট্রিলিয়ন ডলারে পৌঁছে যায়। অন্য কথায়, হামলার ফলে আল-কায়েদার ব্যয় করা প্রতি ১ ডলারের বিপরীতে আমেরিকার ৭০ লাখ ডলার ক্ষতি হয়েছে। হামলার তাৎক্ষনিক অর্থনৈতিক ক্ষতির পরিমাণ ৫ হাজার ৫০০ কোটি ডলার, এর মধ্যে ৮০০ কোটি ডলার ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার পুনর্গঠনে ব্যয় করা হয়েছে। পেন্টাগন সংস্কার বাবত ১০০ কোটি ডলার ব্যয় হয়েছে।

২০১০ সাল অবধি প্রত্যক্ষভাবে অর্থনৈতিক ক্ষতির পরিমাণ ছিল ১২ হাজার ৩০০ কোটি ডলার। যার মধ্যে শুধুমাত্র বিমান সংস্থাগুলো ৬ হাজার ৩০০ কোটি ডলার হারিয়েছে। পর্যটকদের সংখ্যা হ্রাস, বিমানের জ্বালানির ব্যয় বৃদ্ধি এবং ইরাক ও আফগানিস্তান যুদ্ধকে এই ক্ষতিগুলোর কারণ হিসাবে দায়ী করা হয়। হামলা চালানোর মাত্র চার দিনের মাথায় বিমান ইন্ডাস্ট্রি ১৪০ কোটি ডলারের ক্ষতির সম্মুখীন হয়। হামলায় ব্যবহৃত চারটি বিমানের মূল্য ছিল সাড়ে ৩৮ কোটি ডলার।

হামলা পরবর্তী দশ বছরে, হোটেল ব্যবসা ৬ হাজার কোটি ডলারের ক্ষতির সম্মুখীন হয়। যদি এই হামলাটি না হতো, তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই সময়ের মধ্যে ৭ কোটি ৮০ লাখ পর্যটক পেত। এর মাধ্যমে তারা ৬০ কোটি ডলার পর্যন্ত আয় করতে পারত। এই সময়ের মধ্যে পরিসেবা খাত থেকে ৮৩,০০০ চাকরি হারিয়ে যায় অথবা বলা যায় বেতন হিসেবে ১ হাজার ৭০০ কোটি ডলারের ক্ষয়ক্ষতি হয়। নিরাপত্তা খাতে ব্যয় হয় ৫৮ হাজার ৯০০ কোটি ডলার। কিছু প্রতিবেদনে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে, ভবিষ্যতে প্রায় সমপরিমাণ অর্থ ব্যয় হবে ইরাক ও আফগান যুদ্ধের অবসরপ্রাপ্ত সৈনিকদের চিকিৎসা ও জীবন বীমাতে। তবে এ যুদ্ধ দুটির সামগ্রিক ব্যয় কতো হতে পারে সে ব্যাপারে কিছু মতপার্থক্য রয়েছে। কিছু হিসেব অনুযায়ী, যুদ্ধ দুটির জন্য মোট ব্যয় ৬ হাজার ট্রিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে।

সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে, বেশ কয়েকটি বই এবং উপন্যাস লেখা হয় ৯/১১ নিয়ে। এগুলোতে হামলার পূর্বের ও পরের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন ফুটিয়ে তোলা হয়। জনপ্রিয় সাহিত্যগুলোতে সাধারণ মানুষের মনোজগতে এবং দৈনন্দিন জীবনে ৯/১১ কেমন প্রভাব ফেলেছিল তা দেখানো হয়। কিছু বিশ্লেষক এবং লেখক আক্রমণের ব্যাপকতা দেখে প্রচণ্ড বিস্মিত হয়ে বিভিন্ন ষড়যন্ত্র তত্ত্ব প্রচার করে। তবে অধিকাংশ বিচক্ষণ মানুষ বুঝতে পারে এই ঘটনা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আমেরিকার পররাষ্ট্র নীতির ফলাফল।

৯/১১ এর হামলা নিয়ে মিডিয়াতে তোলপাড় শুরু হয়। সাম্প্রতিক সময়ের ইতিহাসে এমন ঘটনা খুব কমই ঘটেছে, যা নিয়ে বারবার এমন বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। সংবাদপত্রে প্রকাশিত আর্টিকেলগুলোতে অনেক মৌলিক প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়... কারা এটি করল? কীভাবে করল? কেন করল? যারা এই আক্রমণগুলোকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সমর্থন করেছিলেন তাদের নিয়ে প্রশ্ন উঠে। ইতিহাসের এক সন্ধিক্ষণে এই হামলা হয়েছিল। তাই ৯/১১ নিয়ে অনেক কিছুই লেখা হয়েছে, হচ্ছে এবং সামনে আরও অনেক লেখালেখি হবে।

মানবাধিকার, গণতন্ত্র, আন্তর্জাতিক আইন ইত্যাদির ধারক ও বাহক হিসেবে আমেরিকা নিজেকে দাবী করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমেরিকা মানবাধিকারের পরোয়া করে না। এবং তার নিজের নাগরিকদের অধিকার ও স্বাধীনতার লাগাম টেনে ধরে। ৯/১১ এই বাস্তবতা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়েছে।

অধিকাংশ বিচক্ষণ মানুষ বুঝতে পারে এই ঘটনা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আমেরিকার পররাষ্ট্র নীতির ফলাফল।

মার্কিন সরকার জাতিগত বিদ্বেষ তৈরি করে। অশ্বেতাঙ্গদের লক্ষ্য বানিয়ে বর্ণবাদকে কার্যকরভাবে উৎসাহ দেয়। তথাকথিত 'সন্ত্রাসবাদের' মামলা পরিচালনার জন্য একটি সামরিক আদালত গঠন করা হয়। নতুন আইন পাশ করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হয়। এর ফলে তদন্ত, গ্রেফতার ও আদালতের শরণাপন্ন না করে, দীর্ঘ সময় ধরে যে কোনো ব্যক্তিকে বন্দী করে রাখার ক্ষমতা পেয়ে যায় তারা। মিডিয়াগুলোর উপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ বাড়তে থাকে। বিচার বিভাগ ও জনসাধারণের সমর্থনে সরকারের নির্বাহী শাখার আকার ও কর্তৃত্ব বৃদ্ধি পায়। একের পর এক স্বাধীনতা হরণকারী, 'সন্ত্রাসবিরোধী আইন' পাশ হতে থাকে। বিচার বিভাগ দুর্বল হয়ে পড়ে। রাষ্ট্রপতিকে এমন ক্ষমতা দেওয়া হয় যে আমেরিকার রাষ্ট্রপতি এবং তৃতীয় বিশ্বের একজন স্বৈরশাসকের মধ্যে পার্থক্য করা কঠিন হয়ে পড়ে।

এরওপর আমেরিকা বিদেশের মাটিতে গুম, অপহরণ, অবৈধভাবে আটক ইত্যাদি কার্যক্রম বাড়াতে থাকে। সিআইএ- বিভিন্ন স্থানে গোপন কারাগার খুলে বসে। বিভিন্ন সন্দেহভাজনদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য এমন দেশগুলোর হাতে হস্তান্তর করতে থাকে, জিজ্ঞাসাবাদের ক্ষেত্রে নির্দয় আচরণের জন্য যারা পরিচিত। এসব কিছু আমেরিকার নিজ ভূখণ্ডে স্বাধীনতা'র উপর হস্তক্ষেপের একটি কালো অধ্যায়ের সূচনা করে।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার স্লোগান দেয় আমেরিকা। কিন্তু বাস্তবে তারা এর বিপরীত আচরণ করে। আরব বসন্তকে ব্যর্থ করে দিয়ে স্বৈরাচারী ও একনায়ক শাসকদের ক্ষমতায় ফেরাতে আমেরিকা সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে। মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে বিপ্লবীদের দমনের জন্য তারা স্বৈরাচারী সরকারদের সাহায্য করেছে। ইসরায়েলের নিরাপত্তার জন্য জনগণের সরকারের পরিবর্তে স্বেচ্ছাচারী, কর্তৃত্বপূর্ণ সামরিক সরকার কিংবা রাজতন্ত্রকে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে।

আমেরিকা তার স্বভাবগত কূটচাল চেলে,

কপটতার আশ্রয় নিয়ে 'বন্ধু রাষ্ট্র' এবং 'শত্রু রাষ্ট্রের' পরিবর্তে বিশ্বকে 'ভাল' এবং 'মন্দের' ভিত্তিতে বিভক্ত করছে। 'সন্ত্রাসী' ও 'সন্ত্রাসবাদের পৃষ্ঠপোষকতাকে' সকল মন্দের প্রতিশব্দ বানিয়েছে। এগুলো যেন সমস্ত মানবতার শত্রু। অন্যদিকে বিশ্ববাসীর সামনে নিজেকে উপস্থাপন করছে কল্যাণ প্রতিষ্ঠাকারী, শান্তি প্রতিষ্ঠাকারী হিসেবে। যারাই মার্কিন নীতির বিরোধিতা করছে তাদের সবাইকে মন্দের পক্ষ নেবার দায়ে অভিযুক্ত করছে। আমেরিকা নিজেদের শান্তি প্রতিষ্ঠার একমাত্র হকদার হিসেবে দাবী করছে, অথচ তাদের ইতিহাস এক রক্তাক্ত ইতিহাস।তাদের ইতিহাস অশান্তি, অন্যায়, জুলুম, খুনোখুনি, লুটপাটের ইতিহাস।

মুসলিম কারা? ....তারা কেন এমনটা করল? এই ধর্মের মাঝে কী এমন রয়েছে, যে ১৯ জন ব্যক্তি এধরণের প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে? নিজেদের এভাবে বিলিয়ে দেয়? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে হাজার হাজার লোক, তাঁদের রবকে খুঁজে পেয়েছেন। ৯/১১ হামলার মূল লক্ষ্য ছিল আমেরিকাকে নিজের মাটিতে আঘাত করার মাধ্যমে তার আগ্রাসনের জবাব দেওয়া। কিন্তু এর মাধ্যমে অসংখ্য মানুষ ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় লাভ করেন।

৯/১১-এর রাজনৈতিক প্রভাবও ছিল সুদূরপ্রসারী। সিস্টেম হিসেবে এটি গণতন্ত্রের ভঙ্গুরতা ও অকার্যকারিতা প্রকাশ করে দিয়েছে। প্রমাণ করেছে গণতন্ত্র সরলমনা লোকদের ধোঁকা দেওয়ার একটি হাতিয়ার মাত্র।

৯/১১ ছিল এক অভূতপূর্ব আক্রমণ। সম্ভবত এটিই ইতিহাসের একমাত্র ঘটনা যা বিশ্বের প্রায় সকলেই একই সময়ে টেলিভিশনের পর্দায় দেখেছে... চীনের পর্বতমালার বৃদ্ধ মহিলা থেকে শুরু করে আফ্রিকার আদিবাসী গোত্র... সবাই। এই মর্মান্তিক হামলার দৃশ্য বিভিন্ন যৌক্তিক প্রশ্নকে সামনে নিয়ে এসেছে- কেন এই হামলা হলো? কারা করল ? কিভাবে করল? ইন্টারনেট ব্যবহারের সুবিধা আছে কিন্তু এই প্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজেননি এমন মানুষ পাওয়া দুষ্কর- মুসলিম কারা? ....তারা কেন এমনটা করল? এই ধর্মের মাঝে কী এমন রয়েছে, যে ১৯ জন ব্যক্তি এধরণের প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে? নিজেদের এভাবে বিলিয়ে দেয়? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে হাজার হাজার লোক, তাঁদের রবকে খুঁজে পেয়েছেন। ৯/১১ হামলার মূল লক্ষ্য ছিল আমেরিকাকে নিজের মাটিতে আঘাত করার মাধ্যমে তার আগ্রাসনের জবাব দেওয়া। কিন্তু এর মাধ্যমে অসংখ্য মানুষ ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় লাভ করেন।

ইসলাম সম্পর্কে সচেতনতা একজন সাধারণ মুসলিমের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে। তাঁকে এক অন্য উচ্চতায় পৌঁছে দেয়। ৯/১১ এর হামলা

সাধারণ মুসলিমদের মধ্যে ইসলামের ব্যাপারে তীব্র সচেতনতাবোধ সৃষ্টি করে। নিজেদের ইতিহাস, আত্মপরিচয় নিয়ে গর্বের বোধ তৈরি করে দেয়। পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা তৈরি করে। মুসলিমরা যে পথের অনুসরণ করতে চায়, সে পথ বেছে নেবার সাহস যোগায়। এটি তাঁদেরকে সেই স্বৈরাচারী সরকারগুলোর মোকাবেলায় উদ্বুদ্ধ করে, যে সরকার তাঁদের দুনিয়া ও আখিরাত উভয়কেই ধ্বংস করেছে। ৯/১১ 'জিহাদ', 'গাজওয়া', 'শাহাদত', "রিবা'আত" এবং 'গাজী', হিজরত ও 'মুজাহিদ' এর মত শব্দগুলোর পুনর্জন্ম দেয়। ৯/১১ বিপ্লবে জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে। যার ফলাফল ছিল আরব বসন্ত। আরব বসন্ত কিছু স্বৈরশাসনকে ধ্বংস করে এবং সাময়িকভাবে কিছু আরব দেশকে স্বৈরাচারী শাসকের দাসত্ব থেকে মুক্তি দেয়। বিপ্লবের এই প্রথম ঢেউটি স্তিমিত করে দেওয়া হয়েছে কিন্তু তা সত্ত্বেও, আরব বসন্ত মুসলিম বিশ্বে একটি মৌলিক পরিবর্তন এনেছে- আরব বসন্তের পূর্বে জনসাধারণের মানসিকতা যেমন ছিল এখন আর তেমন নেই। মনোজগতে এক বিপ্লব ঘটে গিয়েছে। বিপ্লবের এই নতুন তরঙ্গ, লড়াইকে জারি রাখবে। এই সংগ্রাম অব্যাহত থাকবে যতক্ষণ না এই দ্বীন, তার হারানো গৌরব ফিরে পায়। এবং মানবজাতি সমস্ত আধুনিকতম দাসত্ব থেকে মুক্তি না পায়।

বিশ্বজুড়ে আমেরিকার নিপীড়নের শিকার ব্যক্তিরা প্রতিশোধ নিতে চায়। ৯/১১ এই বিষয়টি সামনে নিয়ে এসেছে। আমেরিকার জন্য এটি এক সতর্ক সংকেত। কিন্তু দাম্ভিক মার্কিন নীতি নির্ধারকরা এখনো সতর্ক হয়নি। ৯/১১ থেকে শিক্ষালাভ করে তাদের পররাষ্ট্রনীতিতে ইতিবাচক পরিবর্তন আনেনি। এর কারণটাও খুব সহজে বোঝা যায়- আমেরিকার হুঁশ ফেরার জন্য আরও ব্যাপক হামলা দরকার। বিশ্বজুড়ে আমেরিকার জুলুম চিরতরে বন্ধ করার জন্য আরও কয়েকটি ৯/১১ প্রয়োজন। অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন যে কেউ এটি বুঝতে পারবে, যে যুক্তরাষ্ট্র এই যুদ্ধে হেরে যাচ্ছে; তবে শত্রুর সাথে

কৌশলগত ভারসাম্য অর্জনের দিক থেকে আমরা এখনও, দুই থেকে তিন দশক দূরে রয়েছি।

পরিশেষে, ৯/১১-এর হামলায় শাহাদাত লাভকারী, পরিকল্পনাকারী এবং মাস্টার মাইন্ড বীর মুজাহিদদের উদ্দেশ্যে একটি সংক্ষিপ্ত বার্তা-

অভিনন্দন আপনাদের! আপনারা আপনাদের ওয়াদা পূরণ করেছেন! আপনারা প্রকৃত জীবনের পথ দেখিয়েছেন। আল্লাহ আপনাদের মঙ্গল করুক এবং দ্বীন ও উম্মাহর জন্য আপনাদের খেদমতের সর্বোত্তম পুরষ্কার দান করুক। আমেরিকার বিরুদ্ধে দুঃসাহসিক প্রতিরোধ গড়ে তোলার মাধ্যমে আপনারা বিশ্ববাসীর সামনে উপস্থাপন করেছেন 'সুপার পাওয়ার' আমেরিকার প্রকৃত বাস্তবতা।

কিন্তু দাম্ভিক মার্কিন নীতি নির্ধারকরা এখনো সতর্ক হয়নি। ৯/১১ থেকে শিক্ষালাভ করে তাদের পররাষ্ট্রনীতিতে ইতিবাচক পরিবর্তন আনেনি। এর কারণটাও খুব সহজে বোঝা যায়- আমেরিকার হুঁশ ফেরার জন্য আরও ব্যাপক হামলা দরকার। বিশ্বজুড়ে আমেরিকার জুলুম চিরতরে বন্ধ করার জন্য আরও কয়েকটি ৯/১১ প্রয়োজন।

৯/১১ আক্রমণ সম্পর্কে কিছু তথ্য ও পরিসংখ্যান

- ১৯ জন আক্রমণকারীদের মধ্যে ৪ জন ছিলেন আপন ভাই; তাঁদের মধ্যে ওয়ালিদ আশ-শিহরি এবং ওয়াইল আশ-শিহরি এই দুইজন, মুহাম্মাদ আতা রহিমাহুল্লাহ'র নেতৃত্বাধীন দলের সদস্য ছিলেন। নওয়াফ আল হাযমি ও সালিম আল হাজমি, হানি হানজুর দলে ছিলেন। আল্লাহ তাঁদের সবাইকে কবুল করুন!

.....

- ৬০ এরও অধিক দেশের নাগরিক ৯/১১ এর হামলায় হতাহত হয়েছিল। হতাহতের মধ্যে শতকরা ৮০ ভাগ ছিল পুরুষ।

.....

- ৯/১১ এর হামলায় হতাহতের সর্বশেষ ঘটনাটি ২০১৭ সালে চিহ্নিত করা হয়। এখন পর্যন্ত মৃতদেহগুলোর মধ্যে শতকরা ৪০ ভাগের পরিচয় নিশ্চিত করা যায়নি।

.....

- টুইন টাওয়ার বা বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্রের নির্মাণ কাজ শেষ হয় ১৯৭৩ সালে। লম্বা সময় পর্যন্ত টুইন টাওয়ার বিশ্বের সবচে উঁচু ভবন হিসেবে পরিচিত ছিল। ৯/১১ এর হামলার সময়ও এটি বিশ্বের সর্বোচ্চ আকাশচুম্বী ভবনের একটি ছিল। মুজাহিদের বীরত্বপূর্ণ হামলায় বালুর প্রাসাদের মতোই ভেঙে পড়ে আমেরিকার গর্বের টুইন টাওয়ার।

.....

- হামলায় ধ্বংসাবশেষের পরিমাণ ছিল প্রায় দশ লাখ টন। ধ্বংসস্তূপ পরিষ্কার করার জন্য প্রয়োজন পড়ে প্রায় ৩ কোটি কর্মঘন্টার। হামলার পরের এক বছরের পুরোটা লেগে যায় ধ্বংসাবশেষ পরিষ্কারের কাজে।

.....

- ১৯ জন শাহাদতপ্রত্যাশী মুজাহিদদের মধ্যে ৫ জন ছিলেন বিবাহিত বা বাগদত্ত। অনেকের একাধিক সন্তানও ছিল। কিন্তু, পারিবারিক বন্ধন, মায়া, মমতা, ভালোবাসা শাহাদাতের প্রতিযোগিতা থেকে পিছু হটাতে পারেনি তাঁদেরকে।

- মুজাহিদদের দলনেতা ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মাদ আতা। একইসাথে তিনি ছিলেন হামলার প্রধান পরিকল্পনাকারী এবং সমন্বয়কারী।

- হামলার মোট ব্যয় ৫ লাখ ডলারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। হামলার যাবতীয় খরচ – ফ্লাইং স্কুলে অধ্যয়ন, বাড়ি ও হোটেল ভাড়া এবং বিমানের টিকেট ইত্যাদি এর মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত ছিল।

অথচ সবচে রক্ষণশীল পরিসংখ্যান অনুসারেও, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বরকতময় এ হামলার ফলে আমেরিকার অর্থনৈতিক ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ছিল পাঁচ ট্রিলিয়ন ডলারেরও অধিক। সহজভাবে বললে, আল-কায়েদার ব্যয়কৃত প্রতিটি ডলার, আমেরিকার ১০০ কোটি ডলার সমপরিমাণ ক্ষতি করেছে।

- হামলায় অংশগ্রহণকারী মুজাহিদরা বেশ মিতব্যায়িতার পরিচয় দিয়েছিলেন। বরাদ্দকৃত বাজেট থেকে কম খরচের জন্য সর্বাধিক চেষ্টা করেছেন। কাজের জন্য প্রয়োজন না হলে তাঁরা সাধারণত সস্তা হোটেলে থাকতেন, ছাড়ের টিকিট কিনতেন। ৯/১১ কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, অভিযান শেষে ২৬ হাজার ডলার ফেরত দিয়েছিলেন মুজাহিদরা ।

- টুইন টাওয়ারে কর্মরত কর্মীদের গড় সংখ্যা ছিল ৫০ হাজারের মতো। আর গড় দৈনিক দর্শনার্থীর সংখ্যা ছিল ১ লাখ ৪০ হাজার।

- হামলার কারণে টুইন টাওয়ারে আগুন লাগে। এই আগুন দেখা যায় ২০ মাইল দূর থেকেও ।

- বেইসমেন্টে বিমানের আঘাতের ফলে আগুনের সূত্রপাত হয়। আগুন ক্রমাগত জ্বলতে থাকে। ৬৯ তম দিনে এসেও আগুন নেভাতে পারেনি বিশ্বের তথাকথিত সুপার পাওয়ার আমেরিকা!

- হামলার পরের ২৩০ দিন পর্যন্ত উদ্ধার কর্মীরা ধ্বংসস্তূপ থেকে মৃতদেহ অনুসন্ধান করেছে।

‘নিরাপত্তা পুরো মানবজাতির জন্য। শুধু তোমাদের নিজেদের জন্য নয়। একজন সচেতন নাগরিক কখনোই মেনে নিতে পারে না যে, রাজনীতিবিদেরা তার নিরাপত্তাকে হুমকির মুখে ফেলবে। তোমরা আমাদের কর্মকাণ্ডকে সন্ত্রাসবাদ হিসেবে উপস্থাপন করো। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তোমরাই হলে সন্ত্রাসী। তোমরাই সন্ত্রাসবাদ চালাও। ক্রিয়া যেমন হয়, প্রতিক্রিয়াও তেমনিই হয়। তোমরা ইরাক, আফগানিস্তান এবং ফিলিস্তিনে যতো মানুষ হত্যা করেছ, যে ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছ তার বিপরীতে আমাদের প্রতিক্রিয়া ছিলো খুবই সামান্য। সারা বিশ্বকে হতবাক করে দিয়ে তোমরা একজন বৃদ্ধ ও বিকলাঙ্গ শাইখ আহমাদ ইয়াসীনকে হত্যা করেছ। এ নির্মম হত্যাকাণ্ডই তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য-প্রমাণ হিসেবে যথেষ্ট। আমরা ওয়াদা করছি যে- অবশ্যই আমেরিকাকে আঘাত করে এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ আমরা নেব। ইনশা আল্লাহ!

তোমরা মারা গেলে তোমাদের মৃতরা হয় নিরপরাধ (তাদের মৃত্যুর মূল্য আছে)। আর আমরা মারা গেলে আমাদের মৃতদের কোনো মূল্যই নেই। কেন? কোন ধর্মে বলা আছে যে তোমাদের রক্ত আসলেই রক্ত, আর আমাদের রক্ত- পানি? প্রতিটি ক্রিয়ারই একটি সমান প্রতিক্রিয়া আছে এবং এটিই হচ্ছে ন্যায়ের মূলনীতি। আর যারা বিদ্বেষের সূচনা করে তারাই এর প্রতিক্রিয়ার জন্য দায়ী’।

ইমামুল মুজাহিদিন

শাইখ উসামা বিন লাদেন

(আল্লাহ তাঁর ওপর রহম করুন!)

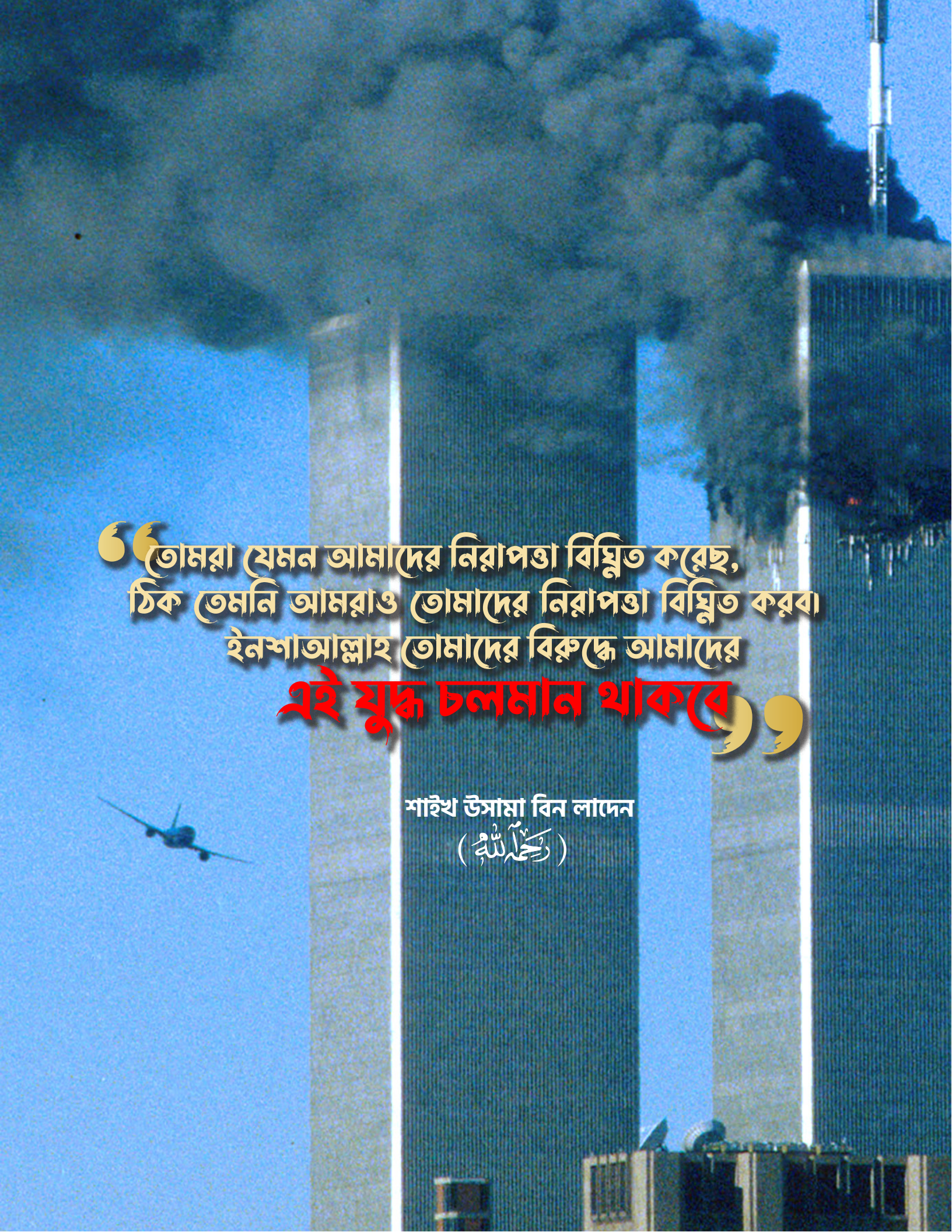

“তোমরা যেমন আমাদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করেছ,
ঠিক তেমনি আমরাও তোমাদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করব।
ইনশাআল্লাহ তোমাদের বিরুদ্ধে আমাদের
এই যুদ্ধ চলমান থাকবে”

শাইখ উসামা বিন লাদেন
(رحمه الله)